গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৩ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ২২ - ২৮ জুলাই, ২০১১ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব উদ্বেগজনক

রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি প্রস্তাব করেছেন, স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত তাঁরা পরীক্ষা তুলে দেবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া কৌশল অনুসরণ করে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী সরাসরি পরীক্ষা ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার কথা না বলে পরীক্ষাকে ঐচ্ছিক করার কথা বলেছেন। কিন্তু হঠাৎ এই প্রস্তাব কেন? শিক্ষামন্ত্রী দু'টি যুক্তি দিয়েছেন। এক, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি; দুই, পরীক্ষা সম্পর্কে ছাত্রদের ভীতি। অর্থাৎ শুধু কেন্দ্রীয় নীতি বলেই নয়, মন্ত্রী মনে করেন, ভীতি দূর করার জন্যও পরীক্ষা দূর করা দরকার। কিন্তু এটা কী ধরনের যুক্তি! এ তো মাথাব্যথা দূর করার জন্য মাথাই উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা! ছাত্ররা আরও অনেক কিছুতে ভয় পায়। যেমন অনেক ছাত্র গণিতে এবং ইংরেজিতে ভয় পায়। সেগুলিও তা হলে সিলেবাস থেকে বাতিল করতে হয়। অনেক ছাত্রের আবার পড়াশোনাতেই আগ্রহ থাকে না। তাদের অনাগ্রহকে মূল্য দিয়ে কোনও অভিভাবক কি চাইবেন সন্তানের পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে? তা ছাড়া যে ছাত্র অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ভয় পেয়ে পরীক্ষাতেই বসল না, সেই ছাত্রই নবম শ্রেণী থেকে প্রবল সাহস নিয়ে পরীক্ষায় বসবে এমন যুক্তি হাস্যকর। একই ধরনের হাস্যকর ও অবৈজ্ঞানিক যুক্তিতে প্রাথমিকে ইংরেজি ভাষাশিক্ষা তুলে দিয়েছিল পূর্বতন সিপিএম সরকার। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নেতৃত্বে ১৯ বছর লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে সরকারকে ইংরেজি ফিরিয়ে আনতে বাধ্য করেছিল রাজ্যের মানুষ। সেই আন্দোলনে রাজ্যের প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

নতুন সরকারের শিক্ষামন্ত্রী পরীক্ষা তুলে দেওয়ার পক্ষে যে যুক্তি দিয়েছেন, তিন দশক আগে প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি ও পাশফেল তুলে দেওয়ার সময় সিপিএমের নেতা-মন্ত্রীরাও সেই একই যুক্তি করেছিলেন। বলেছিলেন, 'ফেল করার ভয়ে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে আসতে ভয় পায়। তাই এত ড্রপআউট।' এর দ্বারা সিপিএম নেতারা আসলে ড্রপআউটের মূল কারণটিকেই আড়াল করতে চেয়েছিলেন। সীমাহীন দারিদ্র, ন্যূনতম পরিকাঠামোর অভাব, সর্বোপরি জনশিক্ষা সম্পর্কে সরকারি মন্ত্রী-নেতা-আমলাদের ন্যূনতম আবেগ ও সদিচ্ছার অভাবই এই ড্রপআউটের কারণ। দরিদ্র-নিম্নবিত্ত পরিবারের ছাত্রদের বিরাট একটা অংশকে পড়া ছেড়ে পরিবারের জন্য রোজগারে অংশগ্রহণ করতে হয়। চায়ের দোকানে, হোটেলে, রেস্টুরেন্টে, কৃষিকাজে বা ধনী-উচ্চবিত্ত পরিবারে পরিচারক-পরিচারিকা হিসাবে কাজ করতে হয়। পুঁজিবাদী সমাজ প্রতি মুহূর্তে ধনী-দরিদ্রে এই যে বৈষম্য সৃষ্টি করে চলেছে, তাকে আড়াল করে ড্রপআউটের দায় পরীক্ষা ব্যবস্থার উপরই চাপাতে চেয়েছিলেন তাঁরা। তাই ড্রপআউট তো কমেইনি, উপরন্তু শিক্ষারই বারোটা বাজিয়েছেন তাঁরা। এ জন্যই চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষা তুলে দেওয়ার পরও এ রাজ্যে স্কুলছুটের সংখ্যা কমেনি, কিন্তু শিক্ষার সর্বনাশ ঘটে গেছে।

ঘরে ঘরে সাধারণ অভিভাবকরা জানেন, সিপিএম সরকারের শিক্ষানীতি ছাত্রছাত্রীদের

ছয়ের পাতায় দেখুন

এ আই ডি এস ও-র বিক্ষোভ। ১২ জুলাই, কলেজ স্ট্রিট।

সরকারি কলেজ শিক্ষা বেচাকেনার শপিং মল হতে পারে না

সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ডিএসও সহ কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের প্রতিবাদ আন্দোলনকে তীব্র কটাক্ষ করে কিছু সংবাদ মাধ্যমে অভিমত প্রকাশিত হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরামর্শদাতা মেন্টর গ্রুপের এক সদস্য 'সরকারি কলেজ, ধর্মশালা নাকি?' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে ফি বৃদ্ধির পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন। ঐ মেন্টর গ্রুপের প্রধানও সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, 'যে-কোনও কলেজ ভালভাবে চালাতে গেলে অর্থের প্রয়োজন। তাই মাঝে মধ্যে ফি বাড়াতে হয়।' তাঁদের বক্তব্য, প্রেসিডেন্সির কলাবিভাগের ছাত্রদের ৮০ শতাংশ এবং বিজ্ঞানের প্রায় ৫০ শতাংশ ছাত্র প্রাইভেট টিউশান নেয় এবং তার জন্য তাদের ৬০০ থেকে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত মাসে খরচ হয়। তাই, তাঁদের প্রশ্ন, কলেজে ফি বাড়লেই আপত্তি কেন? তাঁরা আরও বলেছেন, প্রেসিডেন্সির অধিকাংশ পড়ুয়া মোবাইলে কথা বলার জন্য অনেক বেশি টাকা খরচ করেন। মাসে দেড়শো টাকা ফি নিয়ে তাদের আপত্তি তোলা অন্যায়।

ফি বৃদ্ধির পক্ষে এই ধরনের সওয়াল এই প্রথম নয়, সিপিএম শাসনেও ফি বৃদ্ধির পক্ষে এই ধরনের সওয়াল বারবার করেছেন সিপিএম নেতারা। বিমান বসু যুক্তি করেছিলেন, ছাত্ররা প্রতিদিন আটটা করে আইসক্রিম খায়, মারুতি চড়ে কলেজে আসে, বাড়তি ফি দেবে না কেন? এস এফ আইও সেদিন এই যুক্তি তুলে ফি বৃদ্ধিকে সমর্থন জানিয়েছিল।

কিছু ছাত্র মোবাইলে কথা বলে বা রেস্টুরেন্টে গিয়ে অনেক খরচ করে, এসব দেখিয়ে ফি বৃদ্ধির পক্ষে যাঁরা ওকালতি করছেন তাঁরা কি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব মানুষের কোনও খোঁজ খবর রাখেন? বাস্তব হল, একদিকে তীব্র দারিদ্র্য ও অন্যদিকে শিক্ষার ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিকীকরণের পরিণামে গরিব ও নিম্নবিত্ত ঘরের ছাত্ররা আজ উচ্চশিক্ষার আঙিনায় মূলত আসতেই পারে না। যার ফলে, উচ্চশিক্ষা ইতিমধ্যেই কার্যত সম্পন্ন পরিবারের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে। তবুও সামান্য যে অংশ ঘটিবাটি বিক্রি করে বা নানাজনের সাহায্য নিয়ে উচ্চশিক্ষার দরজায় পৌঁছায়, এভাবে ক্রমবর্ধমান হারে ফি বৃদ্ধি ঘটলে তাদের সামনে বাড়তি প্রতিবন্ধকতা তৈরি হবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ফলে দেশের জনসংখ্যার ৯০ ভাগ গরিব সাধারণ মানুষের স্বার্থের নিরিখে বিচার করলে এই ফি বৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে জনস্বার্থবিরোধী এবং এই কারণে তা প্রতিরোধে আন্দোলনের বাস্তবতা পুরোমাত্রায় রয়েছে।

প্রেসিডেন্সির মেন্টর গ্রুপের বক্তব্য, যারা পারবে তারা ফি দেবে না কেন? এটাকে যদি তাঁরা নিয়ম হিসাবেই ধরেন, তাহলে অন্যান্য ক্ষেত্রে এই নিয়ম চালু করার পথে তাদের সরব হওয়া উচিত। যেমন রেশন দ্রব্যের দাম যারা দিতে পারবে দিক, যারা দিতে পারবে না তাদের বিনা পয়সায় দেওয়া হোক। ট্রেনে, সরকারি বাসে যারা ভাড়া দিতে পারবে কেবল তাদের কাছ থেকেই ভাড়া নেওয়া হোক, অন্যদের বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুযোগ দেওয়া হোক। মেন্টর গ্রুপের যুক্তিধারা থেকে উদ্ভূত এই যুক্তি কি রাজ্য সরকার মানবে?

আসলে 'যারা পারবে তারা দিক, গরিবদের

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে গণকনভেনশন

রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সিপিএম সরকার গত ৩৪ বছরে বিরোধী দলের শত শত কর্মী ও নেতাকে জেলে ভরেছে। এঁদের কেউ বিচারের প্রহসনে সাজাপ্রাপ্ত, কেউ বিচারাধীন। বছরের পর বছর, দশকের পর দশক এঁরা জেলে রয়েছেন। এই বন্দীরা সরকারের সীমাহীন নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। বন্দীদের পরিজনেরা লিখিতভাবে, আইনি-পথে বারবার প্রশাসনের কাছে তাদের মুক্তির দাবি জানালেও মুক্তি মেলেনি, মেলেনি কোনও প্রতিকার। কখনও কোনও মন্ত্রী বা তদারককারী অফিসার জেল পরিদর্শনে গিয়ে ফাটা রেকর্ড বাজানোর মতো বলেছেন, বিচার অতিদ্রুত করতে হবে, অন্যায়ভাবে কোনও বন্দীকে আটকে রাখা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু এই পর্যন্তই।

বর্তমানে রাজ্য সরকারে আসীন তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার আগে তাদের ইস্তাহারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তারা নির্বাচিত হলে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেবে। তাদের সরকার গঠিত হওয়ার পর মানুষ স্বভাবতই আশা করছে, রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তি পাবেন।

রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিকে সামনে রেখে ১৪ জুলাই কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত হয় বন্দীমুক্তি কমিটির আহ্বানে গণকনভেনশন। রাজনৈতিক বন্দীদের পরিবার ছাড়াও, সীমান্তবর্তী এলাকায় যাদের সন্ত্রাসবাদীর বা জাল নোট পাচারের মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের পরিজনরাও চোখের জলে নিজেদের অসহায়তার কথা ব্যক্ত করেন।

কনভেনশন যথার্থ অর্থেই গণরূপ নিয়েছিল। উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাগুলির রাজনৈতিক বন্দীদের পরিবার পরিজনের অব্যক্ত যন্ত্রণা আর চোখের জল কনভেনশনে আসা প্রতিটি মানুষের চোখকেই সজল করে তোলে। প্রত্যেকের বুকে ঘৃণা জাগিয়ে তোলে এই ৩৪ বছরের অপশাসনের বিরুদ্ধে, বিচারব্যবস্থার নৈরাজ্য ও দীর্ঘসূত্রতার বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করেছে এই কনভেনশন। নতুন সরকারের কাছে প্রত্যাশা পূরণের দাবি জানানো হয়েছে।

অধ্যাপক মানস জোয়ারদার, ডাঃ সস্মথ ঘোষ, গণআন্দোলনের নেতা সদানন্দ বাগলকে নিয়ে গঠিত ৩ জনের সভাপতিমণ্ডলী কনভেনশন পরিচালনা করেন। মঞ্চে ছিলেন কমিটির সভানেত্রী মহাশ্বেতা দেবী, নাট্যকার বিভাস চক্রবর্তী, মানবাধিকার আন্দোলনের নেতা সুজাত ভদ্র, প্রবীণ সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী, নব দত্ত, বিধায়ক তরুণ নস্কর ও বন্দীমুক্তি কমিটির সম্পাদক ছোটন দাস। হলে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন জেলে মিথ্যা অভিযোগে বন্দীদের কারও মা, কারও দাদা, কারও ছেলে, কারও স্ত্রী।

সাত দফা দাবি সংবলিত মূল প্রস্তাব পাঠ করেন বন্দীমুক্তি কমিটির সম্পাদক ছোটন দাস। তিনি ২০০২ সালে বন্দীমুক্তি কমিটি গঠনের প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করেন। প্রথমেই বলতে উঠে বর্ধমানের এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর

দুয়ের পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে বিরাট গণকনভেনশন

একের পাতার পর

নেতা যাবজ্জীবন কারাবন্দী সুন্দর চ্যাটার্জীর স্ত্রী কমরেড প্রভাতী গোস্বামী বলেন, বর্ধমানের সরপি গ্রামে দীর্ঘদিনের এস ইউ সি আই (সি)-এর সংগঠন ভাঙতে না পেরে একজন কয়লা মাফিয়ার খুনের ঘটনায় এস ইউ সি আই (সি)-র ৬ জন কর্মীকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়। এই মাফিয়াকে আগে ভাড়াটে খুনি হিসাবে কংগ্রেস কাজে লাগাত, পরে কাজে লাগায় সি পি এম। মামলার রায়ে ৬ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। এর মধ্যে ৩ জন ১৬ বছর, ৩ জন ১০ বছর সাজা খাটলেও আজও তাঁদের মুক্তি মেলেনি। তিনি বলেন, নতুন সরকার এঁদের মুক্তি না দিলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব, এমনকী লাগাতার অনশন করব।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালের শয্যা থেকেও বন্দীমুক্তি কমিটির কনভেনশনের কথা ভুলতে পারেননি বিশিষ্ট কবি ও সামাজিক আন্দোলনের বর্ষীয়ান নেতা অধ্যাপক তরুণ সান্যাল। তাঁর লেখা শুভেচ্ছাবার্তা পাঠ করে শোনান অধ্যাপক প্রণব দাশগুপ্ত। তিনি ১৪ জুলাইকে বাস্তিল দুর্গ অবরোধের ঐতিহাসিক দিন হিসেবে উল্লেখ করে বন্দীমুক্তি কমিটির আন্দোলনের সাফল্য কামনা করেন। শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি হিসেবে তিনি মঞ্চের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে নিঃশর্ত বন্দী মুক্তির দাবি করেছেন— এ কথাও জানান।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির উদ্দেশ্যে গঠিত সরকারি রিভিউ কমিটি যেন পক্ষপাত মুক্ত হয়ে সবাইকে ছাড়ে, কেউ ছাড়া পাবে কেউ পাবে না, এটা যেন না হয়— কনভেনশনে লিখিত এই বক্তব্য পাঠান এস ইউ সি আই (সি)-র সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল। দিল্লিতে জরুরি বৈঠকে যাওয়ার জন্য অনুপস্থিত থাকায় দুঃখ প্রকাশ করে লেখা তাঁর এই চিঠি পাঠ করে শোনান অমল চক্রবর্তী।

প্রবীণ সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী বলেন, শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের পক্ষ থেকে আমরা শুরু থেকেই এই আন্দোলনের দাবির সাথে একমত হয়ে লড়াই করছি। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন হয়েছে বারবার। এই দাবি নিয়ে যখন রাজনৈতিক বন্দীদের পরিবারের লোকেরা ও সাধারণ মানুষ মিছিল করেছিল, সেই সময় ব্রিটিশ পুলিশ গুলি চালিয়ে চারজন মহিলাকে শহিদ করেছিল। তাদের শহিদবেদি রয়েছে বৌবাজারের চার মাথার মোড়ে। তিনি বলেন, '৭৭ সালে সিপিএম সরকার নয়, রাজনৈতিক বন্দীদের প্রথম নিঃশর্ত মুক্তি দেয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ১৯৬৭ সালের ১ মার্চ। তিনি বলেন, জনসাধারণের ন্যায্য দাবি নিয়ে লড়াই যারা করে, তদের উপর রাষ্ট্রীয় অত্যাচারে আমরা নীরব থাকতে পারিনা।

নতুন সরকার নীতিগতভাবে রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির সিদ্ধান্ত নিক—দাবি করেন এ পি ডি আর এর দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী। কমিটি ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস অ্যান্ড সেকুলারিজমের (সি পি ডি আর এস) পক্ষে ডাঃ অশোক সামন্ত লাগাতার আন্দোলনের জন্য বন্দীমুক্তি কমিটিকে ধন্যবাদ জানান এবং তাঁরা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে থাকবেন বলে ঘোষণা করেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার এস ইউ সি আই (সি) নেতা কমরেড অনিরুদ্ধ হালদারের ভাই নিত্য হালদার বলেন, কুলতলিতে যেখানে খুনের ঘটনা ঘটেছিল তার ৩০ কিমি দূরে দলীয় এক সভায় ছিলেন কুলতলির বিধায়ক শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড প্রবোধ পুরকায়েত। ন'বারের বিজয়ী এই বিধায়ককে কোনওভাবেই নির্বাচনে পরাজিত করতে না পেরে খুনের মিথ্যা অভিযোগে সিপিএম ফাঁসিয়ে দেয়। তিনি আরও বলেন, জয়নগর থানার চৌভাঙি অঞ্চলে সি পি এম কর্মী খুনের মিথ্যা অভিযোগে ধৃত তাঁর দাদা অনিরুদ্ধ হালদার, অশোক চক্রবর্তী, বাঁশিনাথ গায়েন ও অন্যান্য এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা কেউই ঘটনাস্থলে ছিলেন না। অথচ তাঁদের নামেই মিথ্যা কেস দেয় সিপিএম। তিনি বন্দীমুক্তি আন্দোলনকে গ্রামস্তর অবধি পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তাব দেন।

জয়নগরের বিধায়ক অধ্যাপক তরুণ নস্কর বলেন, আজ পরিবহণ ধর্মঘট সত্ত্বেও এত মানুষের সমাগমে প্রমাণ হয় মানুষের মধ্যে এই আন্দোলন কতটা সাড়া জাগিয়েছে। নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি — নতুন সরকারের কাছে সকলের প্রত্যাশা তৈরি করেছে। রাজ্যপালের সাম্প্রতিক ঘোষণা — আমার সরকারের নীতি হল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করা — এটা প্রত্যাশা বাড়িয়েছে আরও। তিনি জানান, এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি ও যৌথবাহিনী প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছি বিধানসভায়। তিনি বলেন, যদিও কোর্টের ভূমিকা রয়েছে বন্দী মুক্তির প্রশ্নে, তবুও ১৯৮০ সালে বন্দীমুক্তির প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের সদর্থক রায়কে সামনে রেখে সরকারের কাছে নিঃশর্ত মুক্তির দাবি তোলা যায়। ১৯৯২ সালের আইন পরিবর্তন বা নতুন আইনের দাবিও জানানো যেতে পারে। বিনা বিচারে আটক বা মিথ্যা মামলায় কেমনভাবে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়, তার চরমতম প্রমাণ তিনি তুলে ধরেন। জয়নগরের চৌভাঙি খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার এক জন এস ইউ সি আই (সি) কর্মী তাঁর সাজার আদেশ শুনে বিচারপতিকে বলেন, দয়া করে পুলিশ আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিক চৌভাঙি জায়গাটা ঠিক কোথায়? যিনি ঘটনাস্থলই জানেন না তিনি কী করে ঘটনায় যুক্ত থাকেন? কারান্তরালে কি এই মানুষগুলির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাবে?

অনীক পত্রিকার সম্পাদক দীপঙ্কর চক্রবর্তী বলেন, বন্দীমুক্তির প্রশ্নে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। রিভিউ কমিটির টার্মস অফ রেফারেন্সের একটি শর্ত — জেল থেকে বেরিয়ে রাজনৈতিক বন্দীরা কোনও অফেন্স নিজেও করবেন না বা অন্যকে প্ররোচিত করবেন না — এটা অপমানজনক। তিনি এও বলেন, ঐক্যবদ্ধ বন্দীমুক্তি আন্দোলন বাংলার পরম্পরা ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাই বহন করবে।

বিভাস চক্রবর্তী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, বন্দী মুক্তি প্রশ্নে আইনি জটিলতা কী আছে সেটা সরকার বুঝবে, আমাদের আন্দোলন লাগাতার করতে হবে।

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট জনেরা। ১৪ জুলাই।

প্রতুল মুখার্জী বলেন, রিভিউ কমিটি করার দরকার ছিল, এ বিষয়ে অভিজ্ঞদের পরামর্শ অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত কমিটির। তবে, রিভিউ কমিটির সব শর্ত মেনে নেওয়া যায় না।

নদীয়ার তেহট্টের মিথ্যা মামলায় আটক এস ইউ সি আই (সি) সমর্থকদের একজনের স্ত্রী রীনা বেগম বলেন, আমাদের ওখানে ৩০ বছর ধরে এস ইউ সি আই (সি)-এর সংগঠন। তা ভাঙতে সি পি এম খুন করে এস ইউ সি আই (সি)-র নেতা গিয়াসুদ্দিনকে। অন্যান্য নেতাকর্মীদেরও খুন করার চেষ্টা করে বারবার। ইতিমধ্যে নিজেদের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে সি পি এমে'র দু'জন খুন হয়ে যায়। এস ইউ সি আই (সি)-র নেতা কর্মীদের উপর এই খুনের মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়। শুরু হয় অত্যাচার। আমরা বাচ্চাদের নিয়ে অন্যত্র পালিয়ে যাই। ঘটনার পরেও গ্রামে ফিরতে দেয়নি সিপিএম। তেহট্ট থানার পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে এস ইউ সি আই (সি) সমর্থকদের বাড়ি ভাঙে। ৩-৪ মাস পরে গ্রামে ফিরি। পুরুষমানুষরা ঘরছাড়া হতে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় ১৯ জনের বিরুদ্ধে খুনের মিথ্যা মামলা দেয় সিপিএম, পরে তাঁদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। নতুন সরকারের কাছে আশা আমাদের স্বামীরা যেন মুক্তি পায়। তিনি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, আপনজনের মতো চলে এসেছি আপনাদের এই সভায়। বাচ্চাদের ঠেলে সরিয়ে এসেছি এই এত দূরে, আপনারা দেখবেন যাতে আশা পূরণ হয়। একই অঞ্চল থেকে এসেছিলেন মঞ্জু মানোয়ারা মণ্ডল। তাঁর স্বামী, ছেলে, জামাই সকলেই এই মামলায় জেলে রয়েছেন।

সুজাত ভদ্র বলেন, ১৯৭৭ সালে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার নিঃশর্ত মুক্তির ঘোষণা করেনি, বলেছিল 'সাধারণ ক্ষমা' করা হবে। নতুন সরকার গঠিত রিভিউ কমিটির টার্মস অফ রেফারেন্সে কোনও বন্দী মুক্ত হয়ে অফেন্সে প্ররোচিত করতে পারবে না — এই বিষয়টা বাতিল হওয়া উচিত। তিনি বন্দীমুক্তির প্রশ্নে আইনি জটিলতা থেকে কীভাবে মুক্ত হওয়া যায় সে প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, আন্দোলন হল রিমাইন্ডার। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, তিনি রিভিউ কমিটির মধ্যে থেকে বন্দীমুক্তি প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করবেন। সিপিআই(এমএল)-এর প্রদীপ ব্যানার্জী ও অধ্যাপক শুভেন্দু দাশগুপ্ত বক্তব্য রাখেন।

মহাশ্বেতা দেবী বলেন, কে কত দিন জেলে থেকেছেন সেটা বড় কথা নয়, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি চাই। এর জন্য জনমত তৈরি করতে হবে। সরকারকে এ বিষয়ে মনোযোগী করে তুলতে হবে।

সভার সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম ডাঃ সম্মথ ঘোষ বলেন, আন্দোলন বিচ্ছিন্নভাবে না করে সকলকে একসাথে করতে হবে, না হলে দেশ ক্ষমা করবে না। বন্দীমুক্তি কমিটির সহ-সভাপতি ও অন্যতম নেতা সদানন্দ বাগল বলেন, বন্দীমুক্তি কমিটি ঐক্যবদ্ধ ভাবেই কাজ করছে। রিভিউ কমিটি হওয়ার পর এটাই বন্দীমুক্তি কমিটির প্রথম সভা। এই আন্দোলনকে তিনি আরও তীব্র করার আহ্বান জানান।

অধ্যাপক মানস জোয়ারদার বলেন, আন্দোলনের মাধ্যমে যদি শক্তি অর্জন করতে হয়, তাহলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনেই একমাত্র তা সম্ভব।

বন্দীদের পরিজনদের দুর্দশা ও অসহায়তার কথা এবং মানবাধিকার আন্দোলনের নেতাদের যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্যের রেশ সভা শেষ হওয়ার পরেও উপস্থিত মানুষকে আবেগমথিত করে রাখে।

এস এস সি পরীক্ষার্থীদের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কনভেনশন

৯ জুলাই তমলুকের মহেন্দ্র স্মৃতি সদন হলে এসএসসি পরীক্ষায় স্নাতকস্তরে ৫০ শতাংশ নম্বর ও বিএড ডিগ্রি আবশ্যিক না করার দাবিতে এস এস সি পরীক্ষার্থী সংগ্রাম কমিটির পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন শতাধিক এসএসসি পরীক্ষার্থী। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য যুগ্মসম্পাদক শ্রীধর নন্দী, জেলার শিক্ষক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা তপন জানা, বিশিষ্ট শিক্ষক কৃষ্ণপ্রসাদ সামন্ত।

সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অঞ্জন মুখার্জী বলেন, এই নিয়ম চালু হলে একদিকে যেমন এ রাজ্যের হাজার হাজার বেকার এসএসসি পরীক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন, অন্যদিকে বিএড পড়ানোর নাম করে রাতারাতি বহু বেসরকারি ডিগ্রি ও বিএড কলেজ গড়ে উঠবে। যার ফলে শিক্ষার বেসরকারিকরণের পথ প্রশস্ত হবে। বহু গরিব ছাত্রছাত্রী সর্বস্বান্ত হবেন। জেলা জুড়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে অপূর্ব পালকে আহ্বায়ক করে ২৫ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সহ সভাপতি দীপঙ্কর মাইতি।

আইনমন্ত্রী ও কারামন্ত্রীর নিকট সি পি ডি আর এসের গণডেপুটেশন

কমিটি ফর প্রোটেকশন অব ডেমোক্রেটিক রাইটস অ্যান্ড সেক্যুলারিজম (সি পি ডি আর এস) ১৪ জুলাই আইনমন্ত্রী মলয় ঘটকের কাছে এক ডেপুটেশন দেয়। ঐ ডেপুটেশনে ছিলেন সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক প্রণব দাশগুপ্ত, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অমল চক্রবর্তী, প্রভাতী গোস্বামী, সুরজিত দেবরায়, রাজ্য কমিটির সদস্য আইনজীবী অনুরাধা মণ্ডল, সঞ্জয় চ্যাটার্জী।

রাজবন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির প্রশ্নে মন্ত্রী বলেন, সরকার মনোনীত রিভিউ কমিটি এ বিষয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কালাকানুন ইউ এ পি এ ও এন আই এ বাতিল এবং যতক্ষণ না তা বাতিল হচ্ছে সেই কালাকানুন প্রয়োগ না করা, জঙ্গলমহল থেকে ১৪৪ ধারা ও যৌথবাহিনী প্রত্যাহারের দাবি সম্পর্কে মন্ত্রী কোনও সদর্থক উত্তর দেননি। উচ্চ ও নিম্ন আদালতগুলিতে শূন্যপদে বিচারক নিয়োগ না হওয়াতে যে বিচারাধীন বন্দীরা বিনা বিচারে বছরের পর বছর হাজতবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন, সেই সমস্যার প্রতি প্রতিনিধিরা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এরপর প্রতিনিধিরা কারামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে, রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় মুখোমুখি টেবিলে বসে কথা বলার সুযোগ আবার চালু করার বিষয়টি বিবেচনার আবেদন করেন। তারা বলেন, ১৭ মার্চ আই জি (কারা)-র এক নির্দেশে তা বন্ধ হয়ে গেছে। এ আদেশ আইনসম্মত বা ন্যায়সঙ্গত কোনটাই নয়।

প্যারোলের সুযোগ, যাবজ্জীবন দণ্ডাদেশ প্রাপ্তরা যাতে ১৪ বছরের পর (রেমিশন সহ) মুক্তি পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে বলা হয়। মন্ত্রী বলেন, বিষয়টি আই জি (কারার) অধীনে। এ বিষয়ে তার কোনও ভূমিকা নেই।

প্রতিনিধিরা এসব শুনে মনে করছেন, আন্দোলন ছাড়া ঐসব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

ভিশান ২০১৫ মেডিকেল শিক্ষার মান নামিয়ে দেবে

কেন্দ্রীয় সরকার মেডিকেল শিক্ষার উন্নতি এবং গ্রামীণ জনসাধারণের চিকিৎসার কথা বলে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা এবং পরীক্ষা কাঠামোয় বেশ কিছু পরিবর্তন আনতে চলেছে। মেডিকেল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার (এম সি আই) মাধ্যমে এই বিষয়ে তারা পদক্ষেপ নিচ্ছে। 'ভিশান ২০১৫' নামে মেডিকেল শিক্ষাসংক্রান্ত এই মডেলটি নিয়ে শুরুতেই বহু প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন উঠেছে এই মডেলটি গ্রহণ করার পদ্ধতি নিয়েও।

একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিক্ষা সংক্রান্ত যে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছিত। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক, অধ্যাপক, শিক্ষাব্রতী মানুষকে নিয়ে। সেই কারণে আমাদের দেশেও শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধিকারের প্রশ্নটি এতো গুরুত্বপূর্ণ। মেডিকেল শিক্ষার কোর্স, সিলেবাস, পরীক্ষা পদ্ধতি এতদিন পর্যন্ত নির্বাচিত সংস্থা এম সি আই দ্বারাই নির্ধারিত হতো। ১৯৫৬ সাল থেকেই এই সংস্থাটি আছে। কিন্তু এম সি আই-এর পূর্বতন সভাপতি ডাঃ কেতন দেশাই-এর দুর্নীতিকে অজুহাত করে ২০১০-এর মে মাসে এই নির্বাচিত পরিষদটিকে ভেঙে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এক বছরের মেয়াদের জন্য সাত সদস্যের মনোনীত 'বোর্ড অফ গভরনর্স' (বিওজি) গঠন করে। এই বিওজি-কে দিয়েই 'ভিশান ২০১৫' নামক মডেলটি বকলমে কেন্দ্রীয় সরকার চালু করতে চাইছে। মে মাসে এক বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া বিওজিকে দিয়ে মেডিকেল শিক্ষার ভবিষ্যত নির্ধারণ করতে উঠে পড়ে লেগেছে সরকার। অথচ সরকারের উচিত ছিল প্রথমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এম সি আই-এর নতুন বডি গঠন করা। তা না করে মনোনীত বি ও জি-কে দিয়েই এই পরিবর্তন ঘটাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার, যা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক।

মেডিকেল শিক্ষার কোর্স, কারিকুলাম পরিবর্তন করে খসড়া 'ভিশান ২০১৫' এম সি আই-এর ওয়েবসাইটে দিয়ে দেওয়া হয়। ৬ মাসের মধ্যে তিনবার তা পরিবর্তন করে বলা হয়, সরকার ২০১২ সাল থেকেই এটি রূপায়িত করার জন্য বদ্ধপরিকর। কোর্সটিকে দ্রুত রূপায়িত করতে সরকার এতো উঠেপড়ে লেগেছে কেন? এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, যার সাথে মানুষের জীবন-মৃত্যু জড়িত, তা নেওয়ার আগে বিশিষ্ট চিকিৎসক-শিক্ষক এবং শিক্ষাব্রতী সকল মানুষের মতামত নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না কি?

'ভিশান ২০১৫' চালু করার পক্ষে সরকারের প্রথম যুক্তি হল ডাক্তারের সংখ্যা বাড়ানো, দ্বিতীয়ত গ্রামে যাওয়ার উপযোগী চিকিৎসক তৈরি করা, তৃতীয়ত, ভালো ডাক্তার তৈরি করার জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো।

প্রতি বছর পশ্চিমবঙ্গে ১১০৫ জন এবং সারা দেশে ৩৫০০ জন মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে ডাক্তার হচ্ছে। বর্তমানে ভারতে ১ জন ডাক্তার পিছু রোগীর সংখ্যা ১৭০০। বিশ্বে এই গড় হলে ১.৫ ঃ ১০০০। 'ভিশান ২০১৫'-এর উদ্দেশ্য নাকি ২০৩১ সালের মধ্যে এই গড়কে ১ঃ১০০০-এ নিয়ে আসা। অর্থাৎ ডাক্তার বাড়ানোর জন্য তারা আসন সংখ্যা বাড়ানোর কথা বলছে। কথাটা শুনতে ভালো।

কিন্তু বাস্তবে কী হচ্ছে? এম সি আই নির্ধারিত যে ন্যূনতম মানের পরিকাঠামো একটি মেডিকেল কলেজে থাকা দরকার তার ব্যবস্থা না করেই আসন সংখ্যা বাড়ানোর নির্দেশ দিচ্ছে সরকার। এ রাজ্যে ঠিক এই কাজই করেছিল পূর্ববর্তী সিপিএম সরকার। কল্যাণীতে যথাযথ পরিকাঠামো গড়ে না তুলে এবং প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অনুন্নত হাসপাতাল পরিকাঠামো নিয়ে 'কলেজ অফ মেডিসিন' গড়ে তোলা হল যা আজ সংকটের মুখে এবং ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন। ২০০৪-এ মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ খোলা হয়। সেখানেও নিউরোসার্জারি, হেমাটোলজি সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিভাগই নেই। ফলে ছাত্ররা এইসব বিষয়ে পড়বে কীভাবে? পরিকাঠামোর অভাবে মেডিকেল শিক্ষা কী যথার্থভাবে হতে পারছে? এর দায়িত্ব সরকারের নয়? এখান থেকে যারা পাশ করে বার হবে তাদের অসম্পূর্ণ শিক্ষার দায় তো শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষকে জীবন দিয়ে মেটাতে হবে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যে বড় বড় মেডিকেল কলেজগুলি আছে সেখানকার অবস্থাও উপযুক্ত মানের নয়। প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই, নেই পর্যাপ্ত সংখ্যক ক্লাসরুম, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস, শব ব্যবচ্ছেদের ক্লাস, ক্লিনিক্যাল ক্লাস ইত্যাদি। এমতাবস্থায় আসন বৃদ্ধির পূর্বে পরিকাঠামোর যথাযথ উন্নতি না করলে আরও অর্ধশিক্ষিত ডাক্তারের সংখ্যা বাড়বে। যার দায় ডাক্তারি পড়তে আসা ছাত্রদের নয়।

যদিও আসন সংখ্যা বাড়ানোর আর একটি পদ্ধতির কথা তারা বলেছে। এই মডেলে বলা হয়েছে প্রাইভেট-পাবলিক-পার্টনারশিপ পলিসির মাধ্যমে জেলা হাসপাতালগুলিকে 'কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ'-এ পরিণত করা হবে। কার্যত এগুলি হবে পরিকাঠামোবিহীন বেসরকারি মেডিকেল কলেজ। এ ছাড়াও ভাল সংখ্যক প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ গড়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে মেডিকেল শিক্ষা নিয়ে ঢালাও ব্যবসার ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে ব্যাপক হারে ফি বাড়বে। ডোনেশন, ক্যাপিটেশন ফি চালু হবে। মেডিকেল শিক্ষা গরিব মেধাবী ছাত্রদের আয়ত্তে থাকবে না, যাদের হাতে প্রচুর অর্থ আছে তারাই ডাক্তার হতে পারবে। এটাও মেডিকেল শিক্ষার বেসরকারিকরণের একটি ব্লু-প্রিন্ট।

দেশে আরও ডাক্তারের প্রয়োজন আছে এ কথা সত্য। কিন্তু সরকার কি সত্যই এ কথা বোঝে বা সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছে? তা হলে আজও হাজার হাজার জুনিয়র ডাক্তার চাকরি প্রার্থী কেন? ডাক্তার নিয়োগের জন্য পি এস সি-র পরীক্ষা অনিয়মিত কেন? এ রাজ্য সহ সারা দেশে যত সংখ্যক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকা প্রয়োজন তার তুলনায় বাস্তবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা অর্ধেক। তাই সর্বাগ্রে যেটা প্রয়োজন তা হল প্রতিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিকাঠামো এম সি আই-এর ন্যূনতম মান অনুযায়ী গড়ে তোলা এবং উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত নতুন নতুন সরকারি মেডিকেল কলেজ গড়ে তোলা। পাশাপাশি গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নত করে ডাক্তার নিয়োগ নিয়মিত করা। এ ছাড়াও নার্স, প্যারামেডিকেল স্টাফ সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের শূন্যপদ পূরণ এবং অত্যাবশ্যকীয় ওষুধপত্র সহ চিকিৎসার যাবতীয় দায়িত্ব সরকার গ্রহণ না করলে কোনমতেই গ্রামীণ জনসাধারণের স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত করা যাবে না — এই সত্যকেই সরকার আড়াল করছে। তাই পরিকাঠামো যথাযথভাবে গড়ে তুলে তবেই আসন বৃদ্ধি করা উচিত।

'ভিশান ২০১৫'-র পাঠ্যক্রম এমনভাবে সাজানো হচ্ছে যাতে বর্তমানে একজন এম বি বি এস পাশ করা ডাক্তার যা শিখেছে ততটা শিক্ষা আর ঐ ডিগ্রিতে তারা পাবে না। যেমন বলা হচ্ছে, গ্রামের মানুষের চিকিৎসার জন্য এই ডাক্তারি ছাত্রদের গ্রামীণ হাসপাতালে অর্থাৎ প্রাইমারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ক্লিনিক্যাল ট্রেনিং নিতে হবে প্রথম বছরেই। আমরা জানি, এইসব গ্রামীণ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো অত্যন্ত দুর্বল। এখানে ঐ নিম্নমানের পরিকাঠামোয় শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকবে।

প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রমে বলা হয়েছে, একজন এম বি বি এস ডাক্তার (বেসিক ডাক্তার) মূলত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে পারলেই যথেষ্ট। অর্থাৎ রোগীর রোগনির্ণয় ও তার চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞানের যে গভীরতা প্রয়োজন তাকে লঘু করে দিয়ে মূলত রোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত জ্ঞান ও সাধারণ রোগনির্ণয় ও তার চিকিৎসা করতে পারাটাকেই যোগ্যতা হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যেই পঠন-পাঠনের বেশিরভাগ সময়টাতেই গ্রামীণ হাসপাতালগুলিতে (সিএইচসি, পিএইচসি, তালুক হাসপাতাল) ট্রেনিং-এর কথা বলা হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে একজন ডাক্তারকে শুধুমাত্র 'ফিজিশিয়ান অফ ফার্স্ট কনট্যাক্ট' হিসাবে তৈরি করতে চাইছে সরকার। অথচ ভারতবর্ষের প্রথম স্বাস্থ্য কমিশন 'ভোর কমিটি' বেসিক ডাক্তারের মান সম্পর্কে বলেছে, '' দি মোস্ট হাইলি ট্রেইনড টাইপ অব ডক্টর''। সমগ্র ইউরোপ যাকে অনুসরণ করে সেই জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল (জি এম সি) স্নাতকস্তরের ডাক্তারের উচ্চমান নির্ধারণ করে বলেছে, ডাক্তার হবে ''অ্যাজ স্কলারস অ্যান্ড সায়েন্টিস্টস, প্র্যাকটিশনার্স অ্যান্ড প্রফেশনালস''। বিশিষ্ট আন্তর্জাতিকতাবাদী শল্য চিকিৎসক ডাঃ নর্মান বেথুন বলেছেন, মেডিকেল শিক্ষা হল, ''সায়েন্স অ্যান্ড আর্টস অ্যান্ড এথিক্স''। ফলে নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী নিম্নমানের ডাক্তারই তৈরি হবে। এই উদ্দেশ্যেই কোর্সের সময়সীমা সাড়ে চার বছর থেকে কমিয়ে চার বছর করার কথা প্রথমে বলা হয়েছিল। সারা দেশজুড়ে প্রতিবাদ হলে খাতায়-কলমে কোর্স সাড়ে চার বছর রাখতে সরকার বাধ্য হয়েছে। কিন্তু কোর্সে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বাদ দিয়ে কিছু অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে ঢোকানো হয়েছে যেগুলিকে 'ইলেকটিভ সাবজেক্ট' হিসাবে বলা হয়েছে। যেমন ফরেনসিক মেডিসিন, নিউট্রিশানকে বাদ দেওয়া হচ্ছে।

এভাবে বাস্তবে ডাক্তারি শিক্ষার মানের অবনমন ঘটানো হচ্ছে। এ আক্রমণ ভয়াবহ।

এর সাথে পরীক্ষা ব্যবস্থারও বেশ কিছু পরিবর্তন করছে এই কমিশন। যেমন সাড়ে চার বছরে এম বি বি এস পরীক্ষা হয়। তারপর ছাত্রদের ইন্টার্নশিপ হয় এক বছর। ইন্টার্নশিপের শেষে আর কোনও পরীক্ষা এতদিন পর্যন্ত হয়নি। এভাবেই এম সি আই-এর তত্ত্বাবধানে সারা দেশে স্নাতকস্তরে এম বি বি এস একটি স্বীকৃত মেডিকেল ডিগ্রি। কিন্তু 'ভিশান ২০১৫' বলছে, ইন্টার্নশিপ শেষ হলে আরও একটি পরীক্ষা ছাত্রদের দিতে হবে। তারপরেই ইন্ডিয়ান মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট (আই এম জি) হিসাবে রেজিস্ট্রেশন পাওয়া যাবে। অর্থাৎ ইন্টার্নশিপের ট্রেনিং-এর উপর ডাক্তারদের লাইসেন্স পাওয়া নির্ভর করছে। আর ইন্টার্নশিপের মান নির্ভর করবে হাসপাতালের পরিকাঠামোর উপর। তাই পরিকাঠামোর দুর্বলতার দায় ছাত্রদের ঘাড়ে এসে পড়বে। এটা কোন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা?

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট এন্ট্রান্সের ক্ষেত্রেও একটির বদলে দুটি পরীক্ষা নেওয়া হবে। আবার পিজিতে সফলকে প্রথমে এম মেড নামক ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স করে তবে এম ডি অথবা এম এস করার সুযোগ পাওয়া যাবে। যদিও এ সম্পর্কে কোনও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা এই ভিশানে দেওয়া হয়নি।

পরীক্ষা ব্যবস্থায় স্বীকৃত পন্থা সরকারি নির্দেশের এক কলমের খোঁচায় সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। পাঠ্যক্রমকেও দুর্বল করে প্রায় অর্ধশিক্ষিত ডাক্তার তৈরির পরিকল্পনা হচ্ছে, এবং সর্বোপরি মেডিকেল শিক্ষার আসনবৃদ্ধির নাম করে বেসরকারি মালিকানায় কলেজ তৈরির প্রচেষ্টা চলছে। যার পরিণতিতে বর্তমানে যতটুকু শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছিল তাও আর পাওয়া যাবে না। সামগ্রিকভাবে মেডিকেল শিক্ষাই আজ ধ্বংসের মুখে। আন্দ্রে ভেসেলিয়াস, লুই পাস্তুর, এডোয়ার্ড জেনার, আলেকজান্ডার ফ্লেমিং সহ বহু মনীষীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়, মানুষের প্রতি অসীম মমত্ববোধ এবং অগণিত মানুষের আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এই চিকিৎসা বিজ্ঞান। কেন্দ্রীয় সরকার বড় বড় ব্যবসায়ী ও কোটিপতিদের মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে এই মহান পেশাকে ভূলুণ্ঠিত করছে।

মানুষের স্বাস্থ্য তথা জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার এই পরিকল্পনা অবিলম্বে বাতিল করা দরকার। আশার কথা, মেডিকেল শিক্ষক, চিকিৎসক এবং সংশ্লিষ্ট মহল থেকে এই সর্বনাশা ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে। সচেতন ছাত্ররা ভিশান ২০১৫ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে 'অল বেঙ্গল মেডিকেল স্টুডেন্টস ফোরাম'। জনস্বার্থে তাদের এই আন্দোলন জয়যুক্ত হোক।

পুরুলিয়া ঃ

ডিএসও-র আন্দোলনের জয়

বলরামপুর থানা এলাকায় একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে না পারা শতাধিক ছাত্রকে সংগঠিত করে বিডিও-কে ডেপুটেশন দিল অল ইন্ডিয়া ডিএসও। ছাত্ররা দীর্ঘপথ মিছিল করে বিডিও দপ্তরে পৌঁছায়। সেখানে বক্তব্য রাখেন, সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা কমরেড সাবিত্রী মাহাত, কমরেড দীপক কুমার, কমরেড চণ্ডী কুমার। বিডিও ডিএসও প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ব্লকের বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের সাথে বৈঠক করেন এবং সমস্ত ছাত্রদের ভর্তির ব্যবস্থা করেন।

আড়ষা স্কুলে একাদশ শ্রেণীতে চার শতাধিক টাকা ফি নেওয়ার প্রতিবাদে ছাত্রদের সংগঠিত করে প্রধান শিক্ষকের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। আন্দোলনের চাপে প্রধান শিক্ষক পরিচালন সমিতির সাথে মিটিং করে একশত টাকা ফি কমান এবং সমস্ত আবেদনকারী ছাত্রকে ভর্তি নেওয়ার আশ্বাস দেন। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন কমরেড রামপিরিত মাহাত, কমরেড বিজয় সিং মুড়া। পুরুলিয়া শহরে চিত্তরঞ্জন গার্লস হাইস্কুলে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সময় অবৈধভাবে ৫০০ টাকা ডোনেশন আদায়ের প্রতিবাদে কমরেড বিকাশ কুমারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ছাত্রী ও অভিভাবকদের সংগঠিত করে প্রধান শিক্ষিকার কাছে ডেপুটেশন দেয়। প্রধান শিক্ষিকা পরিচালন কমিটির সম্পাদকের সঙ্গে মিটিং করে জানান ছাত্রীদের ডোনেশন ছাড়াই ভর্তি নেওয়া হবে। জয়পুরে আর বি বি হাইস্কুলে একাদশ শ্রেণীতে ৫০ জন ছাত্রের ভর্তির দাবিতে কমরেড ভগীরথ মাহাত-র নেতৃত্বে বিডিও-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিডিও ভর্তির ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন।

তমলুকে যথার্থ জেলা হাসপাতালের দাবি

২ জুলাই পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক জেলা হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর ও জেলার সিএমওএইচ।

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির জেলা সম্পাদক জীবন দাস সহ অনিতা মাইতি, অরবিন্দ সামন্ত, সেখ মানোয়ার আলি, অসীমা পাহাড়ী, সুতপা সামন্তের একটি প্রতিনিধি দল ঐদিন তাদের হাতে একটি দাবিপত্র তুলে দেন। তমলুক হাসপাতাল নামে জেলা হাসপাতাল হলেও তার উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব, বহির্বিভাগে অন্তর্বিভাগে বিল্ডিং-এর অভাব রয়েছে, রক্ত সহ ওষুধের অভাব, ২৪ ঘণ্টা ইসিজি, প্যাথলজি বিভাগ খোলা না থাকা, বছরের পর বছর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট না দেওয়া প্রভৃতি সমস্যার অবিলম্বে সমাধানের দাবি জানিয়েছেন প্রতিনিধিরা। দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে আধিকারিকরা সেগুলি সমাধানের আশ্বাস দেন।

পরিচারিকাদের সন্তানদের জন্য খাতা-পেন-পেন্সিল

আজকের দুর্মূল্যের বাজারে পেটের দায়ে সামান্য অর্থের বিনিময়ে যাঁরা পরিচারিকার কাজ করে অন্যের সংসার সচল রাখেন, পরিচ্ছন্ন করে তোলেন; অন্যের বাড়িতে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে গিয়ে যাঁরা নিজের সন্তানদের যত্ন নিতে পারেন না, সেই পরিচারিকাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনায় উৎসাহ জোগাবার চেষ্টা করে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি। সংগঠনের বেহালা পশ্চিম ইউনিটের পক্ষ থেকে ৯ জুলাই ঐসব শিশু-কিশোর-কিশোরীদের হাতে খাতা-পেন-পেন্সিল ও ইরেজার তুলে দেওয়া হয়। সতীপ্রসন্ন স্কুলে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ৪৫ জন ছেলেমেয়েকে এই সাহায্য দেওয়া হয়। ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট প্রবীণ চিকিৎসক ডঃ দীনেশ চন্দ্র সান্যাল, বিশিষ্ট সমাজসেবী মঞ্জু বর্মণ এবং পরিচারিকা সমিতির জেলা সম্পাদিকা বুলবুল আইচ, অঞ্জলি পালিত প্রমুখ।

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

আপাত দুঃখময় বিপ্লবী জীবনের নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যেই আছে শান্তি ও আনন্দ

(৫ই আগস্ট এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণ দিবস উপলক্ষে মহান নেতার শিক্ষা থেকে কিছু কিছু অংশ আমরা প্রকাশ করছি।)

প্রথমেই বোঝা দরকার কমিউনিস্ট আদর্শ ত্যাগের আদর্শ নয়। আমরা কিছুই ত্যাগ করিনি। একটা ক্ষুদ্র নোংরা জীবন ছেড়ে দিয়ে একটা বৃহত্তর-মহত্তর জীবন গ্রহণ করেছি মাত্র। একে কি কেউ ত্যাগ বলবে? ত্যাগ মানে কী? ধরুন, আপনি এখন কুঁড়েঘরে বাস করেন। আপনাকে এর বিনিময়ে একটা রাজপ্রাসাদ দিয়ে দেওয়া হল, আর আপনি আপনার ভাঙা স্যাঁতসেতে নোংরা কুঁড়েঘরটি ছেড়ে রাজপ্রাসাদে বসবাস শুরু করলেন। আপনার এ কুঁড়েঘর ছেড়ে আসাকে কি আপনি ত্যাগ মনে করবেন? কেউই করে না, আপনিও করবেন না। কারণ, ত্যাগ তো হচ্ছে কোনও কিছু না চেয়েই কিছু ছাড়া অথবা সবকিছু দিয়ে দেওয়া। এ কি তাই? আসলে তো আপনি যত ছেড়েছেন, পেয়েছেন তার অনেক বেশি। কমিউনিস্টরা তাদের বিপ্লবী জীবনকে এই রাজপ্রাসাদের জীবনের থেকেও বৃহত্তর সম্পদ বলে মনে করে। যে জীবনটাকে সে ছেড়ে এসেছে, একজন বিপ্লবীর কাছে সেটা কুঁড়েঘরের জীবনের মতো শুধু দুঃখময় ও নোংরাই নয় — ক্ষুদ্র, নীচ এবং অবমাননাকর। তাই এই দিক দিয়ে বিচার করলে একজন সত্যিকারের বিপ্লবী কিছুই ত্যাগ করেনি। বরং যা সে ছেড়ে এসেছে, অর্থাৎ গাড়ি-বাড়ি, টাকা-কড়ি, বিষয়-সম্পত্তি, আরাম-আয়েস; তার তুলনায় সে হাজার লক্ষ গুণ বড় জিনিস পেয়েছে — সে তার আত্মমর্যাদাবোধ ফিরে পেয়েছে। বিপ্লবীদের অভাব অনটন, হাজার দুঃখকষ্ট ও নির্যাতন যা দেখে সাধারণ মানুষ তাদের জন্য দুঃখ করে, সেই আপাতদৃষ্ট দুঃখময় বিপ্লবী জীবনের নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যে লিপ্ত থেকে একজন বিপ্লবী যে শান্তি এবং আনন্দ খুঁজে পায়, সাধারণ মানুষ বাড়ি, গাড়ি, আরামের মধ্যে তার হদিশ খুঁজে পায় না। বিপ্লবের থেকে বড় সম্পদ, বিপ্লবী জীবনের থেকে বড় জীবন তার আর কিছুই নেই। তাই, বিপ্লবের প্রয়োজনে বিপ্লবী জীবনকে গ্রহণ করতে গিয়ে কোনও কিছু ছেড়ে আসাকেই সে ত্যাগ বলে মনে করে না এমনকী তার নিজের জীবনও নয়। তাই যদি না হত, যা তারা ছেড়ে এসেছে তার প্রতি যদি তাদের এতটুকু মমত্ব এতটুকু ক্ষোভ বা ব্যথাও কোথাও জমা হয়ে থাকত. তাহলে চীনের বিপ্লবীরা একটানা তিরিশটা বছর ধরে বনে-জঙ্গলে এমন করে মরণপণ সংগ্রাম করতে পারত না। বিপ্লবী জীবনের মধ্যে একটা উঁচুদরের মর্যাদাবোধ এবং আনন্দের সন্ধান না পেলে ভিয়েতনামের বিপ্লবীরা এতবড় শক্তির বিরুদ্ধে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর ধরে এতবড় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জোর খুঁজে পাচ্ছে কোথায়? এই বিপ্লবী জীবনের আকাঙ্ক্ষা একজনের মধ্যে প্রবল হয়ে দেখা দিলে তবেই কেবলমাত্র সে বিপ্লবী হতে পারে। আর আমাদের দেশের কমিউনিস্টরা কিছু ছাড়তে হলেই মহাত্যাগ করছেন বলে মনে করেন। কী তাঁরা ত্যাগ করেছেন? গাড়ি, বাড়ি, ধন-সম্পত্তি, আরাম — এই তো? গান্ধীবাদীরা এ দেশে সেই অর্থে অনেক বেশি ত্যাগ করেছেন। কিন্তু কমিউনিস্ট বলে যাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন, তাঁরা একে ত্যাগ মনে করেন কেন? যদিও এ কথা ঠিক একজন সত্যিকারের বিপ্লবী যখন বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আসে, সাধারণ মানুষের জীবনের চাহিদাগুলি যখন তাঁর কাছে অপাঙক্তেয় হয়ে যায়, তখন সাধারণ মানুষ কমিউনিস্টদের, যাঁরা সবকিছু ছেড়ে বিপ্লবী সংগ্রামে জীবনকে নিয়োজিত করেছেন, তাঁদের সাধারণ অর্থে মহাত্যাগী বলে মনে করেন। কিন্তু একজন কমিউনিস্ট ত্যাগ অর্থে এই জিনিসটাকে নেবেন কেন? তাহলে বিপ্লবের তুলনায় এই বাড়ি, গাড়ি, ধন-সম্পত্তি, আরাম — এগুলোকেই তাঁরা বেশি মূল্যবান বলে মনে করেন — অর্থাৎ এগুলোর প্রতি তাঁদের মনের গোপন কোণে প্রবল আকর্ষণ বিদ্যমান। তাই, যাঁরা দেশের জন্য এত ত্যাগ করলেন বলে মনে করেন, বিনিময়ে তাঁদের আসে কিছু চাওয়ার মনোভাব — তা ধন-সম্পত্তিই হোক বা ক্ষমতা-পদই হোক। আমাদের দেশের কমিউনিস্টরাও এই ত্যাগের বিনিময়ে আজ কিছু চাইছে। তাদের ত্যাগ আজ গোটা দেশের ওপর বোঝা হয়ে দেখা দিচ্ছে।

অবশ্য এ কথাও ঠিক, তাঁদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁরা ধন-সম্পত্তি বা ক্ষমতা-পদ এসব কিছুই চাইছেন না, তাঁরা বিপ্লবটাই চাইছেন। কিন্তু তাঁদেরও মনোভাবনা এইরকম যে, তাঁরা বিপ্লবের জন্য ব্যক্তিগত অনেক কিছু ত্যাগ করেছেন বা করছেন। ত্যাগের এই মনোভাব মনের মধ্যে থেকে গেলে কী হয়? বিরুদ্ধ এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়লে, অথবা সংগ্রামের মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ না হলে তাঁরা ধীরে ধীরে মানুষের ক্ষমতার (হিউম্যান এফর্টস্) ওপর সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। যাঁরা গাড়ি-বাড়ি চাইছেন না, ক্ষমতার লোভ বা দ্বন্দ্বের মধ্যে আসতে চাইছেন না, তেমন গান্ধীবাদীদের কী পরিণতি হয়েছে আমাদের দেশে? যদিও তাঁরা ব্যতিক্রম — ব্যতিক্রম ঐ ত্যাগীদের মধ্যে — কিন্তু মানুষের প্রতি, মানুষের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার সংগ্রামের প্রতি তাঁরা আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। তাঁরা এক ধরনের 'সিনিক'। কাজেই, ত্যাগধর্মের এই দু'টি চরম পরিণতি। হয় ত্যাগের বিনিময়ে আসে কিছু চাওয়ার মনোভাব — সেটা যে রূপেই হোক, আর না হয় সময়ের গতিপথে যদি জীবনের আকাঙ্ক্ষিত সফলতা না আসে, তাহলে সংগ্রামের জটিল অবস্থায় ব্যর্থতার সামনে এসে হতাশা দেখা দেয়, তাঁরা মানুষের সমস্ত ক্ষমতা এবং সংগ্রামের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন। আর এইরকম অবস্থায় তাঁদের একদিনের বিপ্লবী চরিত্রের গুণাবলীগুলিও মরতে থাকে এবং সেই অর্থে পূর্বের তুলনায় জীবনের ক্ষেত্রে অধঃপতনও ঘটতে থাকে। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, যারা গাড়ি-বাড়ি-সম্পত্তি চাইল না ক্ষমতার দ্বন্দ্বে নামল না বা বিনিময়ে ব্যক্তিগত কিছু চাইল না, তাদের ক্ষেত্রেও যদি ত্যাগ সম্পর্কে যথার্থ মার্কসবাদ সম্মত ধারণা না থাকে, তাহলে কী হয়? তাঁরা সব কিছু দেখে শুনে হতাশ হয়ে যান, মানুষের সমস্ত ক্ষমতা এবং সংগ্রামের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন অথবা 'সিনিক' হয়ে পড়েন।

আপনাদের মনে রাখতে হবে, ত্যাগের আদর্শ বিপ্লবী আদর্শ নয়। তাই আমি যে কথা বলছিলাম — আমরা কিছুই ত্যাগ করিনি। একটা ক্ষুদ্র, সাধারণ ও নোংরা জীবন ছেড়ে দিয়ে আজকের দিনের বৃহত্তম এবং মহত্তম জীবন গ্রহণ করেছি মাত্র। কেন না আমরা জানি, ঐ সাধারণ জীবনটা না ছাড়তে পারলে এই বিপ্লবী জীবনটা পাওয়া যায় না। তাই এই ছাড়াটা আমাদের কাছে ত্যাগ নয়, কোনও সত্যিকারের বিপ্লবীর কাছেই নয়। অন্য দিকে, কানি পরা বা ঝুপড়িতে থাকাটা তো আর শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার আদর্শ নয়। এ তো আমাদের দেশের পুঁজিবাদী শোষণের ফল হিসাবেই তাদের জীবনে দেখা দিয়েছে। ফলে পুঁজিবাদের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে একদিকে আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ততা, অন্য দিকে সংস্কৃতিগতভাবে বুর্জোয়া প্রভাব এবং অশিক্ষার দরুন তাদের মধ্যে যে জীবনযাত্রা, যে সংস্কৃতিগত, যে রুচিগত মান প্রতিফলিত হচ্ছে, সেটা বিপ্লবী সর্বহারা সংস্কৃতি নয়। এ তো তাকে এ অবস্থায়, পর্যুদস্ত অবস্থার মধ্যে ফেলা হয়েছে। পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে ভালো খাওয়া, ভালো পরা এবং উন্নততর আদর্শ, সংস্কৃতি, রুচি ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে উন্নততর জীবনের জন্যই তো তার সংগ্রাম। তবে সেই শ্রমিকের কাছে ছেঁড়া কাপড় পরে ত্যাগের প্রতিমূর্তি সেজে যাবার প্রয়োজন কী? ভালো জামাকাপড় না থাকলে, যা আছে তাই পরেই যেতে হবে। কিন্তু ভালো জামাকাপড় থাকলে, সেটা লুকিয়ে রেখে মিথ্যাচার করার প্রয়োজন কী? এই ধরনের মিথ্যাচারের ফলে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়ে আছে। তারা এতসব বিচার করে না। তারা বরং যদি দেখে, একজন নেতা, যার কিছুই নেই, ব্যক্তিগত কোনও সম্পত্তি নেই, সর্বস্ব সে রাজনৈতিক আন্দোলনে দিয়ে দিয়েছে, পার্টির জন্য সবকিছু দিয়ে দিয়েছে, অথচ পার্টির কোনও দরদী বন্ধু বা কেউ তাকে একটা 'স্যুট' দিয়েছে, সেই স্যুট পরেই সে ঘুরে বেড়ায়, সারা শীতকাল ধরেই সেই একটা স্যুটই ব্যবহার করে — তাকে তারা মনে করে, মস্ত বড় বাবু, বেশ বড়লোক, বেশ পয়সাপাতি আছে। আমি আগেই বলেছি, গান্ধীবাদী স্বদেশি নেতাদের আচরণের ফলে আমাদের দেশে একটা ধারণাই দাঁড়িয়ে গেছে, যদি নেতারা একটু ভালো জামাকাপড় পরেন, প্রয়োজনেও যদি গাড়িতে চড়েন, তাহলেই সব গেল, তাঁরা আর দেশকে ভালোবাসেন না, জনতাকে ভালোবাসেন না। এরকম ধারণা প্রায় সমস্ত মানুষের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে। আবার, কিছু নেতা এগুলিকে সংস্কার বলে মার্কস-এঙ্গেলস-এর নজির তুলে নিজেরা গাড়ি-বাড়ি, দামি পোশাক ব্যবহার করছেন — জনসাধারণ ও দলের এগুলি দেবার ক্ষমতা আছে কি নেই, তা বিচার পর্যন্ত করছেন না।

এ ধারণাগুলোর কোনটাই সঠিক বিপ্লবী ধারণা নয়। একজন সত্যিকারের বিপ্লবী এ বিষয়টিকে কীভাবে দেখে? সে তার ভালো-মন্দ, তার ভবিষ্যৎ, সমস্ত কিছুই বিপ্লবের স্বার্থে স্বেচ্ছায় পার্টি ও জনসাধারণের ওপর ছেড়ে দেয়। পার্টি তার ক্ষমতা অনুযায়ী তাকে যেমন করে রাখবে, সে আনন্দের সঙ্গে খুশি মনেই সেটা মেনে নেবে। এ নিয়ে তার কোনও মাথাব্যথা থাকবে না। দল যদি তার দু'বেলা খাবার জোগাড়টাও না করে উঠতে পারে, তাহলে তাকে হয় তা নিজেকেই জোগাড় করে নিতে হবে, আর না হয় না খেয়েই থাকতে হবে এবং এটা খুশি মনেই, মনের মধ্যে কোনও ক্ষোভ না রেখেই করতে পারার মানসিকতা চাই, তবেই সে বিপ্লবী। আবার, পার্টি যদি তাকে ভালো জামাকাপড়, প্রয়োজনে গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে পারে, তাহলে তার প্রতিও তার মোহ বা লোভের সৃষ্টি হবে না, তার দ্বারা সে আমিরি অভ্যাসের শিকার বনে যাবে না; প্রয়োজন হলে কোনও দ্বিধা না রেখেই, এক মুহূর্তেই সে সেগুলি পরিত্যাগ করতে পারবে। অর্থাৎ আরামের সামগ্রী না পেলেও যেমন তার কোনও দুঃখ থাকবে না, ক্ষোভ থাকবে না, তেমনি এগুলি পেলেও তার এগুলির প্রতি মোহের সৃষ্টি হবে না। এই হবে একজন সত্যিকারের বিপ্লবীর মানসিকতা এবং এগুলি সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি।

আমি নিজের জীবনেই দেখেছি, গোড়াতে যখন আমরা দল গড়ার কাজ শুরু করেছি, যখন সমর্থনে বিশেষ লোকজন ছিল না, এমনকী মাথা গোঁজার মতো ঘরও জোগাড় করে উঠতে পারিনি, যখন না খেয়ে দিনের পর দিন একটা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে আমাদের একটা নতুন পার্টি গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে, এ নিয়ে সেদিন কিন্তু আমাদের মনে কোনও ক্ষোভ ছিল না। আমরা কত বছর মাদুরে শুয়েছি, কত শীত-গ্রীষ্ম আমাদের এভাবে কেটেছে। আমাদের তখনকার বন্ধুরা আজও তার সাক্ষ্য বহন করবে। তারা দেখেছে, তখনও আমাদের মনে কোনও আক্ষেপ ছিল না। আমরা কতদিন খাইনি, তা নিয়ে আমরা কারোর কাছে কিছু বলতেও লজ্জাবোধ করতাম। কারণ মনে হত, খাওয়া জোগাড় করতে পারিনি, সমর্থক নেই, পাঁচটা পয়সা চাঁদা তুলতে পারিনি, লোকে দেয়নি — এটা আমাদেরই অক্ষমতা। এটার মধ্যে আবার গর্ব করে বলার কী আছে? ত্যাগের কী মাহাত্ম্য আছে? এ বলতেই আমরা লজ্জাবোধ করতাম। এ এক ধরনের মনোভাব আমাদের মধ্যে ছিল। কিন্তু আমাদের মধ্যে এ নিয়ে কোনও গর্বের মনোভাব ছিল না যে, দেশের জন্য আমরা মস্ত ত্যাগ করছি। বরঞ্চ ছিল কাজের অক্ষমতা ও অসফলতা সম্বন্ধে মনের মধ্যে লজ্জাবোধ। আমি আমার কথাই বলতে পারি, তখনও কমরেডরা আমাকে যেমন হাসতে দেখেছে, যে শক্তিতে কাজ করতে দেখেছে, যে 'মুড'-এ দেখেছে; স্বাস্থ্য, বয়স সেসব প্রশ্ন বাদ দিলে আজও তারা সেইভাবেই দেখে। অথচ আজ অবস্থা কী ? আজ আগের তুলনায় দলের অনেক লোকজন বেড়েছে, আগের চাইতে যোগাযোগ অনেক বেড়েছে, আজ একটু কিছু হলেই দশটা কমরেড ছুটে এসে পড়ে। হয়তো জামা ছিঁড়ে গেছে, দশটা কমরেড দৌড়ে আসে, চোদ্দজন সমর্থক দৌড়ে আসে একটা ভাল জামা বানিয়ে দেবার জন্য। তারা জোর করে, না নিলে দুঃখ অনুভব করে, তাদের মনে লাগে। তাহলে কী দেখা যাচ্ছে? এমনিই নেতাদের মানুষ দেয়। তাদের আরামের জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকবে কেন, লোভ থাকবে কেন? আর যদি নেতা হওয়ার পরেও লোকে তাদের কথা না ভাবে, তাহলে বুঝতে হবে, তারা ওপর থেকে পরগাছার মতো নেতা হয়েছে। তারা যদি সাধারণ মানুষের প্রতি সত্যিকারের 'সার্ভিস' দেয়, তাহলে এমনিই সাধারণ মানুষ নেতাদের দেয়। কিন্তু এ সম্পর্কে সতর্ক না থাকলে কী হয়? সেগুলো পেতে পেতে, যদি না তার প্রতি একটা নির্লিপ্ত ভাব থাকে, তাহলে তার 'ভিকটিম' হয়ে যাওয়ার, আরামের শিকার বনে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তখনই বিপদের সৃষ্টি হয়। একদিন কেউ কষ্টের মধ্যে আক্ষেপ না করে থাকতে পেরেছে বলেই চিরকাল তার সেই গুণগুলি বজায় থাকবে এমন কোনও কথা নেই। কাজেই সবসময় এই সংগ্রাম বিপ্লবীদের নিজের ভিতর করতে হয়, সবসময় তাকে এটা পরীক্ষা করতে হয়, 'টেস্ট' করতে হয়, বুঝতে হয়। কাজেই নিজের জিনিসপত্র নিয়ে, কোনও কিছু পাওয়া নিয়ে, খারাপ ভালো নিয়ে একজন বিপ্লবীর আক্ষেপ থাকবে কেন? কোনও কিছু পাক বা না পাক, না পেলে তার এইভাবেই চলবে। কেউ যদি কোনও কিছু দেয়, তাহলেও সে সেটা পরবে, সেখানেও কোনরূপ ভণ্ডামির আশ্রয় নেবে না। হয় তো আছেই তার একখানা স্যুট, কেউ দিয়েছে, কিন্তু পাছে পরে গেলে লোকে অন্যরকম মনে করে, সেইজন্য লোকের কথা ভেবে ধার করে আর একটা সাধারণ জামাকাপড় পরে ভড়ং করে লোককে দেখাতে যেতে হবে যে, 'আমি কত সাদাসিধে' — এর নাম কী? এর নাম নির্ভেজাল ভণ্ডামি। এর নাম হচ্ছে জনসাধারণের মানসিকতার পেছনে পেছনে চলা, জনগণকে শিক্ষিত করা নয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে আমাদের চলবার রীতি কী ? সাধারণ মানুষের যে মানসিকতা, আমাদের চলবার রীতিটা তার থেকে খুব বেশি এগিয়ে গিয়েও যেমন হবে না, আবার তার

পাঁচের পাতায় দেখুন

গাইঘাটায় বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা প্রাপকরা উপেক্ষার শিকার

রাজ্যে প্রায় ৪০ লক্ষ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা জীবনের শেষ লগ্নে এসে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন। যৌবনে এঁরা এঁদের কায়িক ও মানসিক শ্রম সমাজের কাজে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু কর্মশক্তির বিনিময়ে যতটুকু মজুরি পেতেন তা দিয়ে সংসার প্রতিপালনই কষ্টকর হত। ফলে কোনও সঞ্চিত অর্থ এঁদের নেই। কর্মজীবনে কোনও সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পও ছিল না। বর্তমানে এঁদের অনেকেরই দেখাশোনা করার মতো কেউ নেই। বেঁচে থাকার মতো দু'মুঠো অন্নের সংস্থানও এঁদের নেই। প্রায়ই এঁদের অনাহার ও অর্ধাহারে দিনাতিপাত করতে হয়। মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার কোনও উপায় এঁদের নেই। বিপিএল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কিছু মানুষের বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে অনুমোদিত হলেও সঠিক বিপিএল তালিকা না থাকায় এবং পঞ্চায়েতের সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে তালিকা করার ফলে বহু প্রকৃত গরিব বৃদ্ধ মানুষই তালিকা থেকে বাদ যান। ভাতার টাকা খুবই সামান্য, তা দিয়ে পুরো মাস অন্ন জোটানো অসম্ভব। অনেকেই মাসের পর মাস কেটে গেলেও সেই সামান্য টাকাও পান না। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার গাইঘাটায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ভাতা পান না ১২ থেকে ১৮ মাস। ফলে তাঁদের অবস্থা খুবই শোচনীয়।

এই অবস্থায় সমস্ত বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা প্রাপকদের বকেয়া ভাতা প্রদান, মাসের প্রথম সপ্তাহে তা দেওয়া, মাসে ন্যূনতম ১০০০ টাকা ভাতা করা, ৬০ বছরের বেশি বয়সের দরিদ্র সকল বৃদ্ধদের ভাতা দেওয়া, দরিদ্র সকল বিধবাদের ভাতা দেওয়া, মৃত ভাতা প্রাপকদের জমাকৃত ভাতা পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া প্রভৃতি দাবিতে ৪ জুলাই গাইঘাটা বিডিও অফিসে হাজির হয়েছিলেন দু'শতাধিক বৃদ্ধ ও বিধবা, যাঁদের অধিকাংশের বয়স ৬৮-র উপরে। অনেকে ৮০-র কোঠায়। এদিন প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে এই জরাগ্রস্ত মানুষরা এসেছিলেন প্রতিবাদ জানাতে। লক্ষ্মণ মণ্ডলের নেতৃত্বে হরেন্দ্র দেবনাথ, ইব্রাহিম মণ্ডল, বঙ্কুবিহারী দাস ও পারুল দেব গিয়েছিলেন বিডিও-র কাছে ৬ দফা দাবিপত্র পেশ করতে। তাঁদের সাথে ছিলেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-র গাইঘাটা লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড গৌতম দাস। একই দিনে বনগাঁ মহকুমা শাসকের কাছেও দাবিপত্র পেশ করা হয়। বিডিও অফিসের সামনের জমায়েতে এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অশোক দাস বলেন, গাইঘাটা ব্লকে ১০ হাজারের বেশি বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা প্রাপক আছেন, যাঁরা ঘোষিত ভাতা থেকে বঞ্চিত। এই প্রথম বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা প্রাপকরা নিজেদের সংগঠন গড়ে আন্দোলনে নামলেন নিজেদের দাবি আদায় করতে। রাজ্যের প্রতিটি জেলার প্রতিটি ব্লকে এই সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। অশীতিপর বৃদ্ধ বিনয়কৃষ্ণ দালাল, দরিদ্র বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অসহায়তার কথা তুলে ধরেন।

কৃষি উপকরণের দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে বারাসতে বিক্ষোভ

সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির উদ্যোগে ৭ জুলাই দুই শতাধিক কৃষক বারাসত স্টেশনে জমায়েত হন। প্রবল বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে তাঁরা মিছিল করে প্রথমে ডিএম অফিস ও পরে হেলাবটতলায় কৃষি দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান। মিছিল ডিএম অফিসে পৌঁছালে এস ইউ সি আই (সি)-র জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাসের

নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশনে যান।

এরপর মিছিল হেলাবটতলায় পৌঁছালে বিক্ষুব্ধ কৃষকেরা কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করেন। অগ্নিসংযোগ করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড দাউদ গাজী। প্রায় ঘণ্টা খানেক বারাসত জেলা সদরের এই প্রাণকেন্দ্রে রাস্তা অবরোধ চলে। অবরোধস্থলে কৃষকরা বলেন, 'আমাদের জীবনই আজ অবরুদ্ধ! ফসলের দাম নেই অথচ সার-বীজ-কীটনাশক-বিদ্যুৎ-ডিজেলের দাম আকাশছোঁয়া। ঋণ-অনাহার-আত্মহত্যা আমাদের ঘিরে ফেলেছে! সরকারে যেই বসুক আমাদের কথা কেউ ভাবে না। অথচ কৃষিপ্রধান দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক মজুরের ভোটেই সরকার তৈরি হয়।'

৭ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি নিয়ে ৫ জনের এক প্রতিনিধি দল জেলার উপকৃষি অধিকর্তা (ডিডিএ) এর নিকট ডেপুটেশনে যান। অবরোধ চলতে থাকে। বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে অবরোধ তুলতে অনুরোধ করায় অবরোধ তুলে নিয়ে আন্দোলনকারীরা জেলা কৃষি দপ্তরের গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। দাবি আদায়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রতিনিধি দল ফিরে না আসা পর্যন্ত কৃষক বিক্ষোভ চলতে থাকে। কৃষকদের দাবি ছিল, (১) সার ও কীটনাশকের কালোবাজারি বন্ধ করতে হবে, (২) সার-কীটনাশকে ভর্তুকির পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং দাম বাঁধার অধিকার কোম্পানিগুলির হাতে ছেড়ে দেওয়া চলবে না। দাম কমিয়ে সর্বোচ্চ খুচরো দাম (এমআরপি) সরকারকে বেঁধে দিতে হবে এবং (৩) কুইন্টাল প্রতি পাটের দাম কমপক্ষে ৫০০০ টাকা করতে হবে এবং দাবি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে হবে।

জেলা কৃষি উপঅধিকর্তা প্রতিনিধি দলকে জানান, জেলা জুড়ে সারের কালোবাজারি দমনে নজরদারি বাড়াবেন এবং সার ব্যবসায়ী হোলসেলার ও খুচরা ব্যবসায়ীদের নিয়ে ব্লকগুলিতে মিটিং করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং পাটের দামের দাবি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট তুলে ধরবেন। এ দিনের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এস ইউ সি আই (সি)-র জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অজয় বাইন, সংগঠনের সদস্য কানাই ঘোষ ও সংগঠনের জেলা সম্পাদক দাউদ গাজী।

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

চারের পাতার পর

পেছনে পেছনেও চলব না। অর্থাৎ আমরা সাধারণ মানুষের মধ্যেই থাকব, কিন্তু সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে বুর্জোয়ারা যে জট সৃষ্টি করে রেখেছে, আমাদের আচরণের দ্বারা সেগুলো ভাঙবার জন্যই আমরা তাদের মধ্যে থাকব। বুর্জোয়া সংস্কৃতির যে জটগুলি জনসাধারণের মানসিকতার মধ্যে, রুচির মধ্যে, চিন্তার 'প্যাটার্ন'-এর মধ্যে সূক্ষ্ম জালের মতো জড়িয়ে আছে, শুধুমাত্র বিপ্লবী স্লোগান দিয়ে সেগুলো ভাঙা যাবে না। এটা ভাঙতে হলে যেমন জনসাধারণকে বিপ্লবী সংগ্রামে নিয়োজিত করতে হবে, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে নিয়ে এসে সেগুলোকে ভাঙতে হবে, সাথে সাথে ওই ভাঙার কাজটি পুরো সম্পূর্ণ করা তখনই সম্ভব হবে যখন সংস্কৃতিগতভাবে আচরণের দিক থেকেও আমরা টুকিটাকি সমস্ত ব্যাপারে এই বুর্জোয়া জিনিসগুলো আমাদের ব্যবহারের দ্বারা তাদের মধ্য থেকে দূর করতে সক্ষম হব। একমাত্র তখনই দেখা যাবে, বুর্জোয়া সংস্কৃতির এইসব প্রভাব, সাধুসন্তদের প্রতি তাদের আকর্ষণ, ত্যাগধর্মের প্রতি তাদের মোহ — এগুলো তাদের মধ্য থেকে দূর হতে থাকবে, এগুলোর সত্যিকারের শ্রেণীচরিত্র ও শ্রেণীগত স্বরূপ তারা বুঝতে সক্ষম হবে। তারা বুঝতে সক্ষম হবে, কোন মানুষ 'ডেডিকেটেড', সত্যিকারের আদর্শবান, কোনটা সত্যিকারের আদর্শ, কোন রাস্তাটা সত্যিকারের বিপ্লবী রাস্তা, কীসে তাদের মুক্তি। আর, এ যেদিন তারা বুঝতে সক্ষম হবে এবং যত বুঝতে থাকবে তত বুর্জোয়া রাজনীতির প্রভাব তাদের কাটতে থাকবে, 'স্টান্ট' দেওয়া বিপ্লবীদের প্রভাবও তাদের ওপর তত কমতে থাকবে। কাজেই তাদের মধ্যে যেমন নিয়ে যেতে হবে বিপ্লবী রাজনীতি তেমনি এই রাজনীতির সাথে সাথে বুর্জোয়া সংস্কৃতির বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড জেহাদের মনোভাব নিয়ে সর্বহারা সংস্কৃতিকেও তাদের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশের তথাকথিত কমিউনিস্ট নেতাদের আচরণ জনতাকে সে সম্পর্কে সচেতন তো করেছেই না, বরং জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতি, রুচি, বিচারধারায় নানাদিক থেকে বুর্জোয়া ভাবধারার যে প্রভাব জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে; এইসব আচরণের দ্বারা, ভণ্ডামির দ্বারা সেগুলো টিকিয়ে রাখতেই সাহায্য করা হচ্ছে। আর এইভাবে জনতার মধ্যে বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রভাব যদি টিকে থাকে, তাহলে অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে হাজার মারমুখী সংগ্রাম পরিচালনা করা সত্ত্বেও জনতার মধ্যে বিপ্লবী ভাবধারা, বিপ্লবী মানসিকতা ও বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার পথে তা প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করে চলবে।

ব্যক্তিগত আচরণের এই সমস্ত নানা দিক সম্পর্কে প্রশ্ন করলেই এইসব তথাকথিত কমিউনিস্ট নেতারা বলবেন, এসব ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাঁদের দলের সাধারণ কর্মীরাও মনে করে, এটা তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। অর্থাৎ তাঁদের একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার আছে আর একটা রাজনৈতিক ব্যাপার আছে। যেন ব্যক্তিগত জীবনে ধ্যানধারণা, ভালোলাগা, মন্দলাগা, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ ও ন্যায়নীতির ধারণাগুলি বুর্জোয়া সংস্কৃতি ও বুর্জোয়া সম্পর্কবোধের দ্বারা পরিচালিত হওয়া চলে, শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন এবং মাও-এর কিছু বই মুখস্থ করে গরম গরম বক্তৃতা দিতে পারলে, আর অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে কিছু কিছু মারমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলেই সর্বহারা বিপ্লবী বা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হওয়া যায়। কমিউনিস্ট হওয়ার মতো কঠিন সাধনা ও জটিল সংগ্রামের বিষয়টিকে এরা কত সহজ করে দিয়েছে। আর এরই ফলে এই দলগুলির পার্টি মেম্বারশিপ দেওয়ার রীতিটাও কত সহজ হয়ে গেছে। কর্মীরা জনসাধারণের বিপ্লবী সংগ্রামগুলোর সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে নিয়মিত কাজ করছে কি না এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা এবং জীবন পরিচালনার পদ্ধতি কমিউনিস্ট আদর্শে গড়ে তোলার জন্য আপসহীন সংগ্রাম করছে কি করছে না — সেসব দেখার দরকার নেই। তারা 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব' বা 'জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব' মানে কি না, ভোটের সময় পোস্টার মারতে পারে কি না এবং নির্বাচনে জাল ভোট দিতে পারে কি না সেটুকু দেখলেই হল। তাই এইসব কমিউনিস্টদের পকেটে কার্ড না থাকলে এদের আচার আচরণ, রুচিগত মান, ব্যক্তিগত ব্যবহার ও জীবনযাত্রা দেখে এরা কমিউনিস্ট কি না, কেউ বুঝতেই পারবে না। তাই আমি দেশের বিপ্লবী কর্মীদের, মজুরদের, যাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শিখতে চান, তাঁদের কাছে বলব, এই বিপ্লবী তত্ত্ব তাঁদের কাছ থেকেই শিখতে হবে, যাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতি অনুযায়ী ব্যক্তিগত জীবনকে পরিচালিত করার চেষ্টা করছে, সংগ্রাম চালাচ্ছে এবং সফল হয়েছে।

—'কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) একমাত্র সাম্যবাদী দল'
(নির্বাচিত রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড)

কোলাঘাট ঃ রাস্তা ও বাঁধ মেরামতের দাবিতে বিক্ষোভ

কোলাঘাট-জশাড় বাস রাস্তার বিবেকানন্দ মোড় থেকে জশাড় পর্যন্ত প্রায় ৮ কিমি রাস্তা সংস্কারের দাবিতে দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সিদ্ধান্ত ছিল ৬ মাসের মধ্যে কাজ শেষ হবে। কিন্তু দু'বছর হতে চলল রাস্তার কাজ এখনও শেষ হয়নি। ফলে হাজার হাজার মানুষকে প্রতিদিন প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে যাতায়াত করতে হচ্ছে। এখন পূর্তদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, রাস্তার কাজ সিডিউল অনুযায়ী হবে না, গার্ড ওয়ালের পরিবর্তে ড্রামশিট পাইলিং হবে যা খুবই দুর্বল। ছাতিন্দা ডিফেন্স ক্লাব থেকে বিবেকানন্দ মোড় পর্যন্ত প্রায় দেড় কিমি রাস্তার এক পাশ জলের পাইপ লাইন না সরানোর জন্য চওড়া হবে না। অথচ রাস্তার ঐ অংশ দিয়ে সবচেয়ে বেশি যানবাহন চলে। রাস্তার মাঝে বিদ্যুতের পোল রেখে দেওয়ায় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাও রয়েছে। প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বারবার জানানো সত্ত্বেও কোনও কাজ না হওয়ায় সিডিউল অনুযায়ী দ্রুত রাস্তার কাজ শেষ করা এবং কোলাঘাট শহরে রূপনারায়ণ নদীর বাঁধ স্থায়ীভাবে মেরামতের দাবিতে কোলাঘাট-জশাড় রাস্তা উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে ৬ জুলাই কোলাঘাট বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিডিও-র অনুপস্থিতিতে জয়েন্ট বিডিও-র নিকট ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন ডাঃ সত্যেশ্বর পাল, মণীন্দ্রনাথ বেরা, শঙ্কর মালাকার, শক্তিপদ সামন্ত, মিলন পাল, গোবিন্দ সরকার। জয়েন্ট বিডিও অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নিয়ে কমিটির প্রতিনিধিদের সাথে মিটিং করে উক্ত সমস্যাগুলি সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গোপাল মাইতি, নব পাত্র প্রমুখ।

কমসোমলের শিক্ষা শিবির

৯-১০ জুলাই বীরভূম জেলা কমসোমলের শিক্ষাশিবির বোলপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৯০ জন কিশোর-কিশোরী এই শিক্ষাশিবিরে অংশগ্রহণ করে। ড্রিল, পিটি, প্যারেড শেখানো হয়। বিভিন্ন মনীষী ও বিপ্লবীদের জীবন সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা হয়। শিক্ষাশিবির পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই (সি)-র জেলা সম্পাদক কমরেড মদন ঘটক। তিনি বলেন, আজকের দিনের সর্বোন্নত বৈজ্ঞানিক আদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ যা বর্তমানে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার মাধ্যমে আরও বিকশিত হয়েছে — সেই মহৎ আদর্শকে হাতিয়ার করেই কমসোমল সদস্যদের নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলতে হবে।

পরীক্ষা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব উদ্বেগজনক

একের পাতার পর

শিক্ষায় কী মারাত্মক পরিণতি ডেকে এনেছে। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার পক্ষে যুক্তি হিসাবে তাঁরা বলেছিলেন, বিদেশি ভাষা ইংরেজির জন্য ছাত্রছাত্রীরা মাতৃভাষাও শিখতে পারছে না। ইংরেজি তুলে দিলে তারা মাতৃভাষা ভালোভাবে শিখবে। তখন ইংরেজিটাও তারা ভালো করে শিখতে পারবে। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে তখন বলা হয়েছিল, মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি শিখতে কোনও অসুবিধা নেই, বরং উন্নত ভাষা ইংরেজি শিখলে মাতৃভাষাও ভালো করে শিখবে। সেদিন সিপিএম নেতাদের যুক্তি কতখানি অসার ছিল তা পরবর্তীকালে শিক্ষার ক্রমাগত অবনমনে প্রমাণ হয়েছে। ২০১০-এ দিল্লিতে যে অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস অফ এডুকেশনাল রিপোর্ট (রুরাল) প্রকাশিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, রাজ্যে স্কুলছুটের সংখ্যা কমেনি। উপরন্তু, ক্লাস ফাইভের শতকরা প্রায় ৬৭ জন ক্লাস ওয়ানের বাংলা পাঠ্যবইও পড়তে পারে না, শতকরা ৫৪ জন ক্লাস টু-এর বাংলা পাঠ্যবই পড়তে পারে না। শতকরা ৬৫ জন ছেলেমেয়ে সরল বিয়োগ করতেই শেখেনি, ৬৪.৫ জন সরল ভাগ করতেও পারে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে শতকরা ৬৩ জনেরও বেশি ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা চিনতে শেখেনি। ইংরেজি তুলে দেওয়ার ফলে বাস্তবে বাংলাটাও যে তারা ভালো করে শিখতে পারেনি, এই রিপোর্টই তার প্রমাণ।

আসানসোলে পথ অবরোধ করে প্রস্তাবের প্রতিলিপি পোড়াচ্ছেন ছাত্রছাত্রীরা। ১৪ জুলাই।

প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ-ফেল পুনঃপ্রবর্তনে সিপিএম সরকারের অনমনীয় মনোভাবের ফলে অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এই সুযোগে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠল বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেগুলিতে ইংরেজি ও পরীক্ষা ব্যবস্থা ঠিকই বজায় থাকল। গরিব ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ সাধ্যের বাইরে গিয়েও সন্তানের শিক্ষার কথা ভেবে ছুটতে বাধ্য হলেন সেদিকেই। পাশাপাশি, ইংরেজি ও পরীক্ষা না থাকার সাথে সরকারি অবহেলা যুক্ত হয়ে রুগ্ন হয়ে উঠতে লাগল সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলি এবং এক সময় সেগুলি উঠে যেতে লাগল। সাধারণ বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলির দিকে তাকালেই যে কারও চোখে এ চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ছাত্রের অভাবে গত ২০ বছরে রাজ্যে প্রায় ৩০০০ স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। খোদ কলকাতায় এই সংখ্যা ১৫০টি।

পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার পক্ষে বলতে গিয়ে কেউ কেউ পাশ্চাত্যের স্কুল শিক্ষায় নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতির উদাহরণ দিচ্ছেন। রাজ্যে এক জন অথবা দু'জন শিক্ষক দিয়ে এখনও ২৫ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় চলে। পানীয় জল, শৌচালয় নেই ৬০ শতাংশ স্কুলে। বহু স্কুলে কোনও বিল্ডিং নেই। কোথাও ক্লাস হয় চালাঘরে, কোথাও গাছতলায়। একজন শিক্ষক আর অত্যন্ত দুর্বল এই পরিকাঠামো নিয়ে যাঁরা নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের কথা বলেন, তাঁরা কি দেশের এই বাস্তব পরিস্থিতি জেনেবুঝে এ কথা বলেন, নাকি বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঠাণ্ডা ঘরে বসে এমন নিদান হাঁকেন?

কেউ কেউ বলছেন, সরকারের এই প্রস্তাব নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষার অধিকার আইন মেনেই। কী আছে সেই আইনে? শিক্ষার কোন অধিকারের কথা তাতে বলা হয়েছে? তাতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষা তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। একজন ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে নবম শ্রেণী পর্যন্ত কোনও পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়েই নবম শ্রেণীতে উঠে যেতে পারবে। তাই 'শিক্ষার অধিকার' এই কথাটার মধ্যে একটা চালাকি আছে। যেমন করে শিশুশ্রম নিরোধক আইন তৈরি করেছে, খাদ্য নিরাপত্তা আইন তৈরি করেছে, তেমনই এটাও একটা আইন। ঐ আইনের দ্বারা যেমন শিশুশ্রম রোধ হয়নি, ক্ষুধার্ত মানুষের খাদ্য জোটেনি, তেমনই এই আইনেও সাধারণ মানুষের শিক্ষা জুটবে না। বড়জোর, অষ্টম শ্রেণীর শেষে একটা কাগুজে সার্টিফিকেট জুটতে পারে, যা দিয়ে সরকারি পরিসংখ্যানে শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়তে পারে, ভারতসভায় 'অশিক্ষা দূরীকরণের' জন্য বাহবা জুটতে পারে, কিন্তু দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের শিক্ষা জুটবে না। আর কেন্দ্রীয় আইন মানার বাধ্যতা? শিক্ষা কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ তালিকার অন্তর্ভুক্ত। তা ছাড়া কোনও রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় নীতিকে যদি জনবিরোধী মনে করে তা হলে তো সেই নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোটাই তার দায়িত্ব। শুধু কেন্দ্রের নীতিকে অন্ধের মতো মেনে যাওয়ার জন্য তো একটা রাজ্যের জনগণ সরকার নির্বাচিত করে না। বাস্তবে শিক্ষিত এবং নামমাত্র শিক্ষিত, এই দুটি শ্রেণীর বিভাগ, যা ইতিমধ্যেই সমাজে সৃষ্টি হয়েছে, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার নীতি তাকে আরও পাকাপোক্ত ও প্রসারিত করবে। অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা যেখানে পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে সেই বেসরকারি স্কুলের দিকে ঝুঁকবে। আর নিম্নবিত্ত-গরিব পরিবারের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার নামে শিক্ষাহীনতার শিকার হবে। ধনী-গরিবের শিক্ষার মানের ফারাক আরও বাড়বে। পূর্বতন সিপিএম সরকার মুখে অন্য কথা বললেও বাস্তবে কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতি নিয়েই চলেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতির ফলে পরিসংখ্যানে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশি দেখিয়ে সরকারি সাফল্যের ঢাক পেটানো যাবে, কিন্তু শিক্ষা বলতে সাধারণের জন্য কিছু থাকবে না। নতুন সরকারের শিক্ষামন্ত্রী এই গুরুতর দিকগুলো কি ভেবে দেখেছেন?

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষা তুলে দিলে মাধ্যমিক শিক্ষাকেও চূড়ান্ত বেসরকারিকরণের দিকে ঠেলে দেবে। তাতে শিক্ষাব্যবসায়ীরা, যারা মানুষের মানুষের কেনার ক্ষমতা নেই বলে

সরকারি কলেজ বেচাকেনার শপিং মল নয়

একের পাতার পর

দিতে হবে না' — এই বক্তব্য হল ধূর্ততার সাথে ধীরে ধীরে সকল ছাত্রদের উপর বাড়তি ফি চাপিয়ে দেওয়ার কৌশল।

ফি বাড়লে গরিব ছাত্রদের অসুবিধা হবে, এ কথা প্রেসিডেন্সির কর্তারা বা ফিবৃদ্ধির সমর্থকরা জানেন না বা বোঝেন না তা নয়। তাই ফি বৃদ্ধিকে মানিয়ে নিতে তাঁরা বলেছেন, গরিব ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে মাইনে পুরোপুরি মকুব করে দিলেই হয়, কিংবা যথেষ্ট বৃত্তির ব্যবস্থা করা যায়। তাহলে নিশ্চয়ই কোনও আপত্তি থাকবে না। কিন্তু কে গরিব? আমাদের দেশে গরিবের যে মানদণ্ড নির্ধারিত হয়েছে সেই মানদণ্ডে দেশে গরিব বলে কেউ নেই। সরকারি নিয়মে শহরের দৈনিক ২০ টাকা খরচ যে করতে পারে, সে আর গরিব নয়। ফলে এ পোড়া দেশে সরকারি নিয়মে ভিখারিও ধনী, ঘরে তার চাল নাই বা থাকুক। ফলে গরিবের জন্য ফি মকুবের কথাটি শুধু কথার কথা। তাছাড়া যাঁরা কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন তাঁরা জানেন, কর্তৃপক্ষ কীভাবে নানা নিয়মের বাহানায়, একের পর এক অসহযোগিতায় ফি মকুব-কে কী সাংঘাতিক হয়রানির বিষয় করে তোলে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের মধ্যে ধনী-গরিব বিভাজন সৃষ্টি করা ঠিক নয়। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে এ দেশের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ, বরেণ্য শিক্ষাবিদ, মনীষী ও ছাত্রসমাজের দাবি ছিল স্বাধীন ভারত সরকার শিক্ষার সম্পূর্ণ আর্থিক দায় বহন করবে। তাদের এভাবে ভাবনার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ ছিল। শিক্ষা তো আর পাঁচটা বিষয়ের মতো নয়, শিক্ষা হল দেশ গড়ার, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ফলে দেশের কথা ভাবলে একটা সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা বিস্তারের সামনে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর না করে পারে না। অথচ আমরা দেখছি, মনীষীদের সেই স্বপ্ন পদদলিত করে আজকের জাতীয়তাবাদী নামধারী লুঠেরা বুর্জোয়া শাসকরা একের পর এক ফি বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের শিক্ষার সামনে প্রবল প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে।

মেন্টর গ্রুপের এক সদস্য প্রশ্ন তুলেছেন, সরকার শুধু দেবে, নেবে না কিছুই? এখানেও বাজার অর্থনীতির বিনিময়ের যুক্তি! স্কুল-কলেজকে শিক্ষার বাজার হিসাবে এদেশের শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাপ্রেমীরা কোনও দিনই ভাবতে পারেননি। দুঃখের কথা, শিক্ষার অঙ্গনে এখন বাজার অর্থনীতির প্রবক্তাদের ভিড়। এঁরা শিক্ষালয়কে বাজারে পরিণত করতে উদ্যত। সরকার কার টাকা ছাত্রদের পেছনে খরচ করে? সরকার জনগণের কাছ থেকে ট্যাক্স হিসাবে যে টাকা নেয় তার অতি সামান্য অংশ ছাত্রদের শিক্ষার পেছনে খরচ করে। জনগণই তো সরকারি কোষাগারের জোগানদার। তাহলে ছাত্রদের কাছে আলাদা করে টাকা দাবি করা কেন?

সরকারের কি সত্যিই আর্থিক সংকট? রাজ্য সরকার যেভাবে এম এল এ-দের বেতন-ভাতা সহ আনুষঙ্গিক খরচ বাড়াচ্ছে, বিধানপরিষদ গঠন করে বছরে কোটি কোটি টাকা খরচের রাজসূয় আয়োজন করছে, মাথাভারি প্রশাসন তৈরি করে খরচ বাড়াচ্ছে, তাতে সরকার আর্থিক সংকটে আছে, বোঝাই দুষ্কর। তাছাড়া অর্থ সংকট হলে সরকার ব্যয়। সংকোচন করবে কোথায়? শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যয়সংকোচন তো জাতির সর্বনাশের আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়া। সরকার ব্যয়সংকোচন প্রয়োজন মনে করলে উপরোক্ত অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বন্ধ করতেই পারে।

ফি বৃদ্ধির বিষয়টা শুধু ছাত্রদের দিতে পারা না-পারার বিষয় নয়। বিষয়টা হল মৌলিক নীতিগত। 'টাকা যার শিক্ষা তার' এটাই যদি হয় শিক্ষার নীতি, তাহলে সার্বজনীন, গণতান্ত্রিক শিক্ষা বলে কিছু অবশিষ্ট থাকে কি? ? শিক্ষা কি এমন জিনিস যে তা হলেও চলে, না হলেও চলে? শিক্ষা একজন মানুষের এবং সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য অপরিহার্য। এরই উপর নির্ভর করছে সভ্যতার অগ্রগতির প্রশ্নটি। যে সমাজের অধিকাংশ মানুষ যত শিক্ষিত, সেই সমাজ তত বেশি পরিমাণে অগ্রসর। তাই শিক্ষাকে বাদ দিয়ে চলে না। আর যা বাদ দিয়ে চলে না, জীবনে এবং সমাজে যা সকল মানুষের স্বার্থে অবশ্যই চাই, তা সকলের কাছে পৌঁছাতে হলে শিক্ষা পরিচালনা করতে হবে সম্পূর্ণ সরকারি অর্থানুকূল্যে। সেই কারণে দাবি উঠেছিল বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার। শুধু প্রাথমিক স্তরেই নয়, অবৈতনিক শিক্ষা, শিক্ষার উচ্চতম স্তর পর্যন্ত চালু করার দাবিও তুলেছিল ছাত্রসমাজ। ফি বৃদ্ধির ঘোষণা বাস্তবে সংবিধানে বর্ণিত সার্বজনীন ও গণতান্ত্রিক শিক্ষার ভিত্তিমূলেই কুঠারাঘাত।

ফি বৃদ্ধির পিছনে অর্থসংকট মেটানোর তাগিদটা নিছক অজুহাত ছাড়া কিছু নয়। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফি বৃদ্ধির দুটো কারণ চিহ্নিত করা যায়। এক, শিক্ষাকে যতদূর সম্ভব বিত্তবানদের মধ্যে কুক্ষিগত করে রাখা এবং চাকরির সীমিত হলেও যতটুকু সুযোগ আছে সেটাকে তাদের করায়ত্ত করার সুযোগ দেওয়া, দ্বিতীয়ত, বেসরকারি শিক্ষা ব্যবসার বাজার তৈরি করে দেওয়া। তীব্র বাজার সংকটে জর্জরিত পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এখন শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি পরিষেবামূলক খাতে বিনিয়োগ করে মুনাফা লুটতে চাইছে। সরকারি উদ্যোগে অবৈতনিক শিক্ষা বেসরকারি মালিকদের শিক্ষা ব্যবসার সামনে অন্তরায়। ফলে সরকারি শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক ফি বাড়িয়ে বেসরকারি শিক্ষার মতোই করে দেওয়া হচ্ছে। বিশ্বায়ন যে সংস্কারের ধারণা এনেছে তার মূল কথা হল বিভিন্ন সামাজিক খাতে বরাদ্দ ব্যাপকভাবে কমানো এবং ধীরে ধীরে তা বন্ধ করে দেওয়া। বিশ্বায়নের নীতি মেনে সরকার জনগণের টাকা জনশিক্ষায় খরচ করবে না, শিক্ষার খরচ বহন করতে হবে ছাত্রদের — এটা মেনে নিলে আগামী দিনে সাধারণ মানুষের পড়াশুনার রাস্তাই বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে কোনও মতেই সরকারি কলেজকে শিক্ষা বেচাকেনার শপিংমল হতে দেওয়া যায় না। প্রেসিডেন্সিতে কে পড়তে পারবে, কে পারবে না তা কি নির্ণয় হবে টাকার দ্বারা? রাজ্যের নতুন সরকার কি প্রেসিডেন্সিকে এই জায়গায় নামাতে চায়? রাজ্যের মানুষ নতুন সরকারের কাছে এ জিনিস প্রত্যাশা করে না।

উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারছে না, সুনিশ্চিত মুনাফার ক্ষেত্র হিসাবে শিক্ষাকেই বেছে নিয়েছে, তারা খুশি হতে পারে, কিন্তু রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ, যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, যারা বহু সংগ্রাম, রক্তপাত, আত্মদানের মধ্য দিয়ে সিপিএম সরকারের পরিবর্তন ঘটিয়েছে, যাদের কাছে কংগ্রেস শাসনের মতোই সিপিএম শাসনেও সন্তানের শিক্ষার স্বপ্ন অধরাই থেকে গেছে, যারা মনে করেছিল সরকারের পরিবর্তন মানে শিক্ষাক্ষেত্রে সিপিএম যে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল তার অবসান হবে, তাঁরা হতাশ হবেন। সরকারের উচিত, সিপিএম সরকারের আমলেও যে নীতির কারণে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সেই নীতির পরিবর্তন করে এমন নীতি গ্রহণ করা, যেখানে কোনও ছাত্রই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে না। তা করতে হলে যেমন শিক্ষার পরিকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন ঘটাতে হবে, তেমনই প্রতিটি স্তরে শিক্ষার খরচ সরকারকেই বহন করতে হবে যাতে অর্থের অভাবে কোনও ছাত্র শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়। আমরা আশা করব, পরীক্ষা ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার মতো উদ্বেগজনক প্রস্তাব কার্যকর করা থেকে নতুন সরকার বিরত থাকবে।

সার কোম্পানিকে মর্জিমাফিক দাম বাড়ানোর অধিকার দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার

কৃষক বিক্ষোভ উত্তরবঙ্গে

কেন্দ্রে কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকারের মালিকতোষণ নীতির কারণে কৃষক ও খেতমজুরদের জীবনে নেমে এসেছে চরম দুর্দশা ও সীমাহীন বঞ্চনা। এই সরকারের বর্তমান সারনীতি, খাদ্যনীতি ও বীজনীতি সাধারণ কৃষকের জন্য শুধু আর্থিক দুর্দশাই ডেকে আনেনি, তাদের আত্মহত্যার পথেও ঠেলে দিয়েছে। এই সরকার দরিদ্র মানুষের উপর অস্বাভাবিক করের বোঝা চাপিয়েছে, আর একচেটিয়া ধনকুবেরদের মুনাফার পাহাড় গড়ার যাবতীয় সুযোগ করে দিয়েছে। পূর্বে সার কোম্পানির মালিকদের জনগণের করের টাকায় যে ভর্তুকি দেওয়া হত, তার ভিত্তিতে সরকার সারের ন্যূনতম দাম বেঁধে দিত। কিন্তু বর্তমানে কোম্পানিগুলিকে পূর্বের চেয়ে আরও বেশি পরিমাণে ভর্তুকি দেওয়া হলেও সারের দাম ঠিক করার দায়িত্ব সরকার সার কোম্পানিগুলির মালিকের উপর ন্যস্ত করেছে। ফলে সার উৎপাদক কোম্পানিগুলি তাদের মর্জিমাফিক সারের দাম নির্ধারণ করছে। এর ফলে খোলাবাজারে যাবতীয় সারের দাম হুহু করে বাড়ছে। এছাড়া সারের গুণমান পরীক্ষা করে দেখার দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত, তারাও তা পালন না করায় বাজারে ভেজাল সারের রমরমা কারবার চলছে। অপরদিকে দেশি-বিদেশি বীজ ব্যবসায়ীরা হাইব্রিড বীজের নাম করে সকল ধরনের বীজ, এমনকী আমন ধানের বীজের দামও অনেক বাড়িয়েছে। অথচ চাষিরা তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে ক্ষোভে দুঃখে ফসল বাজারে ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান মরসুমে উত্তরবঙ্গে পাটের দাম এতটাই নিচে নেমেছে যে, চাষিরা বাজারে পাটে আগুন লাগিয়ে প্রতিবাদ করছে। খেতমজুররাও গ্রামে কাজ না পেয়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে।

কৃষক ও খেতমজুরদের এইসব বঞ্চনার বিরুদ্ধে সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের পক্ষ থেকে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন ব্লকে বিক্ষোভ আন্দোলন চলছে। হলদিবাড়ি ব্লক কৃষি আধিকারিকের নিকট ৫ জুলাই সার ও ধানের বীজের দাম কমানো সহ পাঁচ দফা দাবিপত্র প্রদান করা হয়। এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন কমরেডস ফুলচাঁদ সরকার, সন্তোষ বর্মন এবং মানিক বর্মন। এদিকে পাটের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে ব্লক জে সি আইয়ের ডি পি সি-তে উত্তরবঙ্গ পাটচাষি সংগ্রাম কমিটি ও প্রগতিশীল কৃষক সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখানো হয়। নেতৃত্ব দেন কমরেড সাত্তার সরকার এবং মানিক বর্মন। ৭ জুলাই দিনহাটা-সাহেবের হাট ও পুণ্ডিবাড়ীতে এ আই কে কে এম এসের নেতৃত্বে পাট নিয়ে অবরোধ ও বিক্ষোভ হয়। তাছাড়া সার ও ধানের বীজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিকের কাছে স্মারকপত্র প্রদান করা হয়। এই বিক্ষোভ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন জেলার বিশিষ্ট কৃষক নেতা প্রাক্তন সাংসদ কমরেড দেবেন বর্মন সহ কমরেডস আছরউদ্দিন আহমেদ, সাগর চৌধুরী, জিতেন বর্মন, দীনবন্ধু বর্মন, সুশীল মিত্র প্রমুখ।

ঐ একই দাবিতে কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের ব্লক কমিটির উদ্যোগে একটি প্রতিবাদ মিছিল শহর পরিক্রমা করে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লক কৃষি আধিকারিকের কাছে দাবিপত্র পেশ করে। নেতৃত্ব দেন ব্লকের বিশিষ্ট কৃষক নেতা কমরেড উদয় রায়। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের দাবিদাওয়া নিয়ে কমরেড হরিভক্ত সর্দারের নেতৃত্বে একটি ডেপুটেশন প্রদান করা হয় জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিকের কাছে। ময়নাগুড়ি ব্লকে অনুরূপ কর্মসূচি পালিত হয় কৃষক নেতা কমরেড সুরেশ রায়ের নেতৃত্বে। কৃষক নেতা কমরেড সমসের আলির নেতৃত্বে ধূপগুড়ি ব্লকে কৃষক বিক্ষোভ সংগঠিত হয়।

ফিলিপিন্সে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সম্মেলনে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল লিগ অফ পিপলস স্ট্রাগল' (আই এল পি এস)-এর চতুর্থ সম্মেলনে যোগ দিলেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর এবং এ আই ডি ওয়াই ও-র সর্বভারতীয় কমিটির সভাপতি কমরেড বি আর মঞ্জুনাথ। সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় ৭-৯ জুলাই। আলোচ্য বিষয় ছিল 'উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলুন। বিশ্বজোড়া দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক মন্দা, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও আগ্রাসনকারী যুদ্ধের পরিবেশে দাঁড়িয়ে শোষণ-নিপীড়ন প্রতিরোধ করতে জনগণকে সংগঠিত করুন।' সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন ফিলিপিন্স, ভারত, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, পুয়ের্তো রিকো, গুয়াতেমালা, ইকুয়েডর, আর্জেন্টিনা, স্পেন, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, গ্রিস, ইজিপ্ট, সেনেগাল, বুরুন্ডি, কংগো, নেপাল, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান এবং আরও কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিরা। এঁরা এসেছিলেন নিজের নিজের দেশের বামপন্থী রাজনৈতিক দল ও অন্য কয়েকটি সংগঠনের পক্ষ থেকে।

সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের আলাদা আলাদাভাবে মোট ১৮টি কর্মশালায় ভাগ করে ১৮টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, সেগুলির মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধ, বিদেশি সামরিক ঘাঁটি, বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠা প্রতিরোধ সংগ্রাম, বহুজাতিক পুঁজিপতি কর্তৃক কৃষকদের জমি দখল, বীজ ও সার সংক্রান্ত বিষয়, শ্রমিকদের অধিকার, শিক্ষার বেসরকারিকরণ, যুবকদের কর্মহীনতা ও অন্যান্য সমস্যা, শিক্ষকদের সমস্যা, সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংক্রান্ত সমস্যা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেসরকারিকরণ, শিশুদের অধিকার হরণ প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

কমরেড রণজিৎ ধর সম্মেলনের একটি কর্মশালায় অংশ নেন। এই কর্মশালার আলোচ্য বিষয় ছিল ঃ 'সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী যুদ্ধ এবং প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে জনগণের লড়াইকে ত্বরান্বিত করুন।' তাঁর বক্তব্য গণদাবীতে পরে প্রকাশিত হবে।

যুবকদের কর্মহীনতা ও অন্যান্য সমস্যা সংক্রান্ত কর্মশালায় অংশ নেন কমরেড মঞ্জুনাথ। তিনি যুব সমস্যার বিষয়ে এ আই ডি ওয়াই ও-র বিশ্লেষণগুলি তুলে ধরেন। অর্থনীতির উদারিকরণ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগুলির বেসরকারিকরণের নীতি চালু হওয়ার পর থেকে কীভাবে চাকরির সুযোগ ক্রমাগত কমছে এবং কাজের নিরাপত্তা বলতে কিছুই থাকছে না — তাও তিনি ব্যাখ্যা করেন। গ্রামীণ যুবকদের সমস্যা এবং সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির আগ্রাসী হানাদারি বিষয়েও তিনি বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত সকলেই তাঁর বক্তব্য বিষয় সোৎসাহে সমর্থন করেন। ফিলিপিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল অফ পিপলস রাইটস'-এও কমরেড মঞ্জুনাথ অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিটি কর্মশালায় পাশ হওয়া প্রস্তাব এবং কার্যক্রমের পরিকল্পনাগুলি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে পেশ করা হয় এবং সেগুলি গৃহীত হয়। এরপর 'ইন্টারন্যাশনাল লিগ অফ পিপলস স্ট্রাগল'-এর নতুন কার্যনির্বাহকদের নির্বাচিত করা হয়। সবশেষে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠনগুলির প্রচেষ্টাকে একত্রিত করে সম্মিলিতভাবে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিটি আক্রমণকে রোখবার শপথ নিয়েছেন সম্মেলনে উপস্থিত প্রত্যেক প্রতিনিধি। নেপালের কাঠমাণ্ডুতে আগামী ৭-৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেওয়ার ইচ্ছাও তাঁদের অনেকেই ব্যক্ত করেছেন।

রিষড়ায় ন্যায্য মজুরির দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ

১২ জুলাই হুগলি জেলার রিষড়ায় মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনরত হিন্দুস্তান ন্যাশনাল গ্লাসের শ্রমিকদের উপর রাজ্য সরকারের পুলিশ বিনা প্ররোচনায় নৃশংস লাঠিচার্জ করে। এই আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে এ আই ইউ টি ইউ সি রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে বলেন,

হিন্দুস্তান ন্যাশনাল গ্লাসের ১৭০০ শ্রমিকের মধ্যে ১২০০ শ্রমিকই ঠিকা, যাদের দৈনিক ১০০ টাকা মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছিল। এ আই ইউ টি ইউ সি-র নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে উঠলে কারখানা কর্তৃপক্ষ ঠিকা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ১৪৪ টাকা করার প্রস্তাব দেয় যা স্থায়ী শ্রমিকদের মজুরির এক-চতুর্থাংশ মাত্র। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে ও ন্যায্য মজুরির দাবিতে ১২ জুলাই শ্রমিকরা দলমত নির্বিশেষে সমবেত হয়ে এক প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করে। মিছিল শুরু হওয়ার আগেই শ্রীরামপুর ও রিষড়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী বিনা প্ররোচনায় সমবেত শান্তিপূর্ণ, নিরস্ত্র শ্রমিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। টিয়ার গ্যাস ও লাঠিচার্জে ৫০ জন আহত হয়, ৪ জনের অবস্থা আশংকাজনক, এমনকী রিষড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপরেও পুলিশ লাঠি চালায়। এতে আরও বড় ধরনের ঘটনা, যেমন ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যুও অসম্ভব ছিল না। ৩০ জন শ্রমিককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এই ঘটনায় পূর্বতন স্বৈরাচারী কংগ্রেস ও সিপিএম সরকারের সাথে বর্তমান সরকারের কোনও পার্থক্য শ্রমিকরা খুঁজে পাচ্ছে না।

এই পুলিশি আক্রমণের প্রতিবাদে এবং ধৃত সমস্ত শ্রমিকদের নিঃশর্তে মুক্তি, আহতদের চিকিৎসা, দোষী পুলিশ অফিসারদের কঠোর শাস্তির দাবিতে এ আই ইউ টি ইউ সি-র ডাকে ১৩ জুলাই জেলায় প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়।

অ্যাডহক বর্ধিত মাশুল আদায় বন্ধ করার দাবিতে সিইএসসি দপ্তরে বিক্ষোভ

বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বিরোধী মাস্থলি ভ্যারিয়েবল কস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট (এমভিসিএ) রেগুলেশন প্রয়োগ করে সিইএসসি বিগত দু'তিন মাস ধরে গ্রাহকদের কাছ থেকে যে ইউনিট প্রতি ৪৬ পয়সা অ্যাডহক আদায় করছে, তাকে বেআইনি আখ্যা দিয়ে অবিলম্বে এই জুলুম বন্ধ করা এবং আদায় করা অর্থ গ্রাহকদের ফিরিয়ে দেবার দাবিতে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা) ১৪ জুলাই সিইএসসি অফিসে তুমুল বিক্ষোভ দেখিয়েছে।

বিক্ষোভকারীরা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল করে সিইএসসি হাউসের দিকে গেলে বিরাট পুলিশ বাহিনী বাধা দেয়। পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি শুরু হলে কয়েক শত বিদ্যুৎ গ্রাহক আয়কর ভবনের দিকের গেট দিয়ে সিইএসসি অফিসে ঢুকে পড়ে বিক্ষোভ জানাতে থাকে। এখানেও পুলিশের সাথে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি শুরু হলে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

এরপর সিইএসসি-র কেন্দ্রীয় দপ্তর ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভা হয়। সভায় স্মারকলিপি পাঠ করেন অ্যাবেকার রাজ্য সম্পাদক অনুকূল ভদ্র। বক্তব্য রাখেন, দেবাশীষ চক্রবর্তী, শিবাজী দে, সুব্রত বিশ্বাস, কাজল ভট্টাচার্য, কুণাল বিশ্বাস।

অ্যাবেকার সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস বলেন, বিদ্যুতের বেসরকারিকরণ এবং বাণিজ্যিকীকরণই শুধু করা হচ্ছে তাই নয়, বিদ্যুতের মাশুলকেও নিয়ন্ত্রণহীন করে দেওয়া হয়েছে। এর পরিণতি মারাত্মক। এমভিসিএ হল সেই রেগুলেশন যার মাধ্যমে বিগত সরকার এই কাজ করেছে। এর ফলে বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলো খুশিমতো দাম বাড়াবে — যখন তখন মাশুল বাড়বে।

তিনি বলেন, রাজ্য বণ্টন কোম্পানিতে একই কারণে মাশুল বেড়েছিল ইউনিট প্রতি ৩৮ পয়সা। রাজ্য সরকারের নির্দেশে তা বন্ধ রাখা হয়েছে। সিইএসসি-তে রাজ্য সরকার কেন এই নির্দেশ দিচ্ছে না? সিইএসসি এর ফলে প্রতি মাসে গ্রাহকদের থেকে অতিরিক্ত ৭০ কোটি টাকা বেআইনিভাবে তুলছে।

অনুকূল ভদ্র বলেন, বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর কোথাও অ্যাডহক মাশুল আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়নি। ভারতবর্ষের কোনও রাজ্যেই এই ধরনের রেগুলেশন চালু নেই। তিনি বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে তৈরি করা বামফ্রন্টের এই রেগুলেশন প্রত্যাহার করার জন্য বর্তমান রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানান।

স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, সিইএসসি যে কয়লার দামবৃদ্ধির কথা বলছে তা যদি সত্য হত, তাহলে বর্ধিত খরচের হিসাব পেশ করেই সিইএসসি তা আদায় করতে পারত। ক্যাপটিভ খনির কয়লা ব্যবহার না করে সিইএসসি খনি আরপিজি-কে বিক্রি করে দিয়েছে। সরকারের ভর্তুকির কয়লা বেশি দামে বেচে আরপিজি মুনাফা লুটছে। প্রকৃতপক্ষে এমভিসিএ-র মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছ থেকে অ্যাডহক টাকা নিয়ে সেই টাকায় ব্যবসা করে মুনাফা লোটার পাকা ব্যবস্থা করেছে। কমিশন এবং বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলোর মধ্যে অশুভ চক্র গড়ে উঠেছে। বর্তমান সরকারকে জনস্বার্থে এই চক্র ভাঙতে হবে। রাজ্য সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাসের নেতৃত্বে ৬ জনের প্রতিনিধিদল সিইএসসি কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি দেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন, কুণাল বিশ্বাস, সুভাষ ব্যানার্জী, মণিমোহন ঘোষ ও সত্যেন ভট্টাচার্য।

হোমিও হাসপাতাল নিয়ে ডক্টরস ফোরামের উদ্বেগ

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে বর্তমান সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে, তাকে অভিনন্দন জানিয়ে হোমিও ডক্টরস ফোরাম রাজ্যের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকে এক চিঠি পাঠিয়েছে।

সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক ডাঃ ভাস্কর ভদ্র ও ডাঃ তিমিরকান্তি দাস স্বাক্ষরিত ঐ চিঠিতে বলা হয়েছে, এশিয়ার প্রাচীনতম কলকাতা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সহ ডি এন দে হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও অন্যান্য কলেজগুলি সরকারি নীতির জন্য ভগ্নপ্রায়। পুরুলিয়া জেলার হোমিওপ্যাথিক কলেজটি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ এই কলেজ হাসপাতালগুলিতে এক সময়ে প্রচুর রোগী ভর্তি হয়ে চিকিৎসা পেতেন।

এগুলির উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারলে এর দ্বারা যেমন গ্রাম-শহরের লক্ষ লক্ষ রোগীকে সরকার স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে পারবে, অন্য দিকে অ্যালোপ্যাথিক হাসপাতালগুলির উপর থেকে চাপ অনেকাংশে লাঘব করা সম্ভব হবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে ফোরামের পক্ষে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, সরকার উপরোক্ত বিষয়ে যথাশীঘ্র কার্যকরী পদক্ষেপ নেবে।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

শিক্ষা, স্বাস্থ্যে নতুন সরকারের পদক্ষেপ জনগণের প্রত্যাশাবিরোধী

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসুর সভাপতিত্বে ১২ জুলাই কলকাতায় অনুষ্ঠিত এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে—

"শিক্ষাক্ষেত্রে বিপুল ফি বৃদ্ধির দরজা খুলে দিয়েছিল সিপিএম সরকার। বিস্ময়ের কথা, সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে নতুন সরকারের শিক্ষামন্ত্রীও ফি বৃদ্ধির পক্ষেই সওয়াল করছেন, এমনকী প্রতিবাদী ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করতেও পিছপা হচ্ছেন না। পাশাপাশি, পূর্বতন সিপিএম সরকার চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত চালু করেছিল সর্বনাশা অবাধ প্রমোশন (নো ডিটেনশন) নীতি, যাকে আরও প্রসারিত করে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষা ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার দিকেও তারা এগোচ্ছিল, যদিও জনমতের বিরুদ্ধতায় কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। প্রয়োজন ছিল এই সর্বনাশা নীতি পুরোপুরি প্রত্যাহার করার। কিন্তু তা না করে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির দোহাই দিয়ে নতুন শিক্ষামন্ত্রী অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষা ব্যবস্থা কার্যত বাতিল করার যে সর্বনাশা প্রস্তাব করেছেন, তা শিক্ষার উপরে বিগত সরকারের আক্রমণেরই পরিবর্ধিত পদক্ষেপ এবং অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

"একই ঘটনা আমরা রাজ্যের স্বাস্থ্যনীতির ক্ষেত্রেও লক্ষ করছি। পূর্বতন সিপিএম সরকার রোগীর পথ্য সহ চিকিৎসার প্রায় সর্বক্ষেত্রে চার্জ চাপিয়ে ও বাড়িয়ে এবং প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপের নামে বেসরকারি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মুনাফার জন্য দরজা খুলে দিয়ে যে ভাবে জনগণের অর্থে নির্মিত সরকারি হাসপাতালগুলিকে কার্যত নার্সিং হোমে পরিণত করার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, প্রয়োজন ছিল বর্ধিত চার্জ সহ সেই সব জনবিরোধী পদক্ষেপগুলি প্রত্যাহার করা। কিন্তু তা না করে নতুন রাজ্য সরকার যেভাবে উন্নত পরিষেবা দেওয়ার নামে পূর্বতন সিপিএম সরকারের পদক্ষেপগুলিকেই আরও পরিবর্ধিত রূপে ও ব্যাপকভাবে কার্যকর করতে চলেছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

"রাজ্যের 'পশ্চিমবঙ্গ' নামটি পরিবর্তন করার জন্য নতুন রাজ্য সরকার কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব সম্পর্কে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি মনে করে, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতার পর ভাবনা-চিন্তার ভিত্তিতেই এই রাজ্যের নাম 'পশ্চিমবঙ্গ' করা হয়েছিল এবং তা মেনেও নেওয়া হয়েছিল। সে সময় থেকে প্রফুল্ল কুমার ঘোষ, বিধান চন্দ্র রায়, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, অজয় মুখার্জী ও জ্যোতি বসুর মতো মুখ্যমন্ত্রীরা রাজ্যের বর্তমান নামটি নিয়েই কাজ করেছেন এবং সে জন্য রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কোনও প্রতিবন্ধকতা বা অসুবিধার কথা এঁদের মুখে শোনা যায়নি। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মুখ্যমন্ত্রীত্বে পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার কোনও কাজ খুঁজে না পেয়ে চমক সৃষ্টির জন্য প্রথমে 'ক্যালকাটা' নাম পরিবর্তন করে 'কলকাতা' করে এবং তার পিছনে বিপুল অর্থব্যয়ও করা হয়, তারপর হঠাৎ রাজ্যের নাম পরিবর্তনের জন্য অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। যদিও শেষ পর্যন্ত তারা সেই পরিবর্তন করে উঠতে পারেনি। নতুন সরকারও, রাজ্যের নাম পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত বিপুল অর্থের অপব্যয়ের কথাটিও চিন্তা না করে যে ভাবে পূর্বতন সিপিএম সরকারের পথেই হাঁটতে চলেছে, তা বিস্ময়কর।

"কেন্দ্রীয় সরকার ও পূর্বতন সিপিএম সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নতুন রাজ্য সরকারের এইসব পদক্ষেপ রাজ্যের জনগণের প্রত্যাশাবিরোধী। তাই, রাজ্য কমিটির এই সভা উপরোক্ত জনবিরোধী প্রস্তাবগুলি প্রত্যাহার করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।"

মালিকদের এই পরিবহন ধর্মঘট যাত্রীদের বিরুদ্ধেই

রাজ্যজুড়ে মিনিবাস ও ট্যাক্সিমালিকদের ডাকে গত ১৪ জুলাই পরিবহন ধর্মঘটের সাক্ষী থাকতে হল রাজ্যবাসীকে। যদিও সাধারণ বাসমালিকদের সংগঠনগুলি অন্তত প্রকাশ্যে এই ধর্মঘটে সামিল হয়নি, যদিও ধর্মঘটকারীদের প্রতি তাদের প্রচ্ছন্ন সমর্থনও খুব একটা গোপন থাকেনি। হাওড়া, হুগলি, কোচবিহার প্রভৃতি জেলায় প্রকাশ্যেই ধর্মঘটে সামিল হয়েছে তারা, পথে নামেনি কোনও বাসই। কলকাতাতেও পথে সাধারণ বাস চোখে পড়েছে হাতে গোনা। ফলে নানা কাজে পথে বেরোনো সাধারণ মানুষের হয়রানিই সার।

মালিকদের দাবি সত্যিই অদ্ভুত! অন্তত তাদের এই ধর্মঘটের ফলে আসল হয়রানি যাদের পোহাতে হল, সেই সাধারণ মানুষের দাবির সাথে তার মিল নেই এতটুকুও। বরং বলা চলে, উভয়ের দাবি সরাসরি পরস্পরের বিরোধী। প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির ফলে রীতিমতো নাভিশ্বাস ওঠা সাধারণ মানুষের যখন দাবি— ডিজেলের সাম্প্রতিক বর্ধিত মূল্য অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে, পরিবহন মালিকরা তখন তেলের ঐ মূল্যবৃদ্ধিকে দেখিয়েই দাবি তুলছেন বাস ও ট্যাক্সির ভাড়া আরও বাড়াতে হবে। নতুবা এতটাই নাকি লোকসান হচ্ছে, যে তাদের পক্ষে পরিষেবা চালিয়ে যাওয়াই মুশকিল।

সত্যিই কি তাই? বাস বা ট্যাক্সি মূলত ডিজেলে চলে, ফলে ডিজেলের দাম বাড়লে ঐ সব যান চালানোর খরচও কিছুটা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কতটা? তা কি সত্যিই ঐ সব পরিবহন ব্যবস্থাকে লাভ থেকে লোকসানে ঠেলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট? এ প্রশ্নের কিন্তু যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। সাদা চোখেই যা বোঝা যায় তা হল, লাভ হচ্ছে বলেই বেসরকারি যেকোনও বাস, মিনিবাস বা ট্যাক্সি রাস্তায় নামে, মানবপ্রেমের বা ভ্রাতৃত্বের বোধ থেকে কেউ এইসব ব্যবসায় নামে না (সব ধরনের ব্যবসার ক্ষেত্রেই কথাটি খাটে)। এমনকী ডিজেলের সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির পরেও কিন্তু সাধারণভাবে কোথাও বাস বা ট্যাক্সি রাস্তা থেকে উঠে যায়নি। তারা লোকসান হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র মানুষের অসুবিধের কথা ভেবে নিজেদের পকেট গচ্চা দিয়ে পরিষেবা চালিয়ে গেছে, এমন কথা নিশ্চয় কেউ বিশ্বাস করবে না। অর্থাৎ একটা কথা পরিষ্কার, লাভ তাদের নিশ্চয়ই হচ্ছে। হয়তো জ্বালানির খরচ বাড়ায় সেই লাভের পরিমাণ একটু কমেছে, এই মাত্র।

এবার হিসাব কষা দরকার, লাভ তাদের সত্যিই কতটা কমেছে। এই হিসাবের জন্য আগে জানা দরকার একেকটা বাস বা ট্যাক্সি চালাতে বাস্তবে কতটা খরচ পড়ে, অর্থাৎ দিনে একটা বাস বা ট্যাক্সিকে গড়ে কতটা চলতে হয়, তার জন্য কতটা জ্বালানির দরকার হয় এবং তার দাম কত, আর আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ, যেমন ড্রাইভারের মাইনে, বাস বা মিনিবাসের ক্ষেত্রে অন্যান্য কর্মচারি অর্থাৎ কন্ডাকটর এবং অন্য সহকারীদের মাইনে, গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের খরচ, প্রভৃতির মোট যোগফল কত। এরপর জানা প্রয়োজন, একটা বাস বা ট্যাক্সির দিনে গড় আয় কত। এক্ষেত্রেও জানতে হবে, এরা দিনে গড়ে কতজন যাত্রী বহন করে, তাদের কতজন গড়ে কত দূরত্ব ভ্রমণ করে এবং বর্তমান ভাড়ায় তার ফলে কত আয় হয়। এরপর দেখতে হবে এই দুয়ের মধ্যে ফারাকটা (লাভ বা লোকসান) কত, দ্বিতীয় হিসাবটি প্রথমটির থেকে কতটা বেশি (অর্থাৎ লাভ কতটা), এবং সেই ফারাকটি যুক্তিযুক্ত কিনা।

এ ক্ষেত্রে আরেকটি প্রশ্ন স্বভাবতই এসে পড়বে। কে বিচার করবে কতটা লাভ যুক্তিযুক্ত? নিশ্চয়ই শুধু মালিকদের সদিচ্ছার উপর এই বিষয়টি ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য একটা এমন কমিটি গঠন করা দরকার, যেখানে যেমন মালিকদের প্রতিনিধিরা থাকবে, ঠিক তেমনই থাকবে যাত্রীদের প্রতিনিধিরাও। সরকারের তত্ত্বাবধানে এই রকম কোনও কমিটিই একমাত্র এই বিষয়ে ঠিকঠাক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কারণ বিষয়টি শুধু মালিকদের হাতে ছেড়ে দিলে তারা তো চাইবেই, যতটা পারা যায় বেশি লাভ করতে। তাই সবসময়ই তারা দেখাতে চাইবে তাদের লাভ হচ্ছে খুব কম, তাই তাদের আরও আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হোক। এই যেমন এবারও তারা তাদের দাবির সপক্ষে এক আশ্চর্য হিসেব সরকারের কাছে পেশ করেছে। ঐ ধর্মঘটের পরের দিনই বিকেলে পরিবহনমন্ত্রীর সাথে দেখা করে তারা বলেছে বাস চালিয়ে ১০০ পয়সা আয় করতে তাদের নাকি ১৯৭ পয়সা, অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ খরচ করতে হয় (তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা ১৬-০৭-২০১১)। কারণ, একথা সত্য হলে তো বলতে হয়, তারা পরিবহন নিয়ে ব্যবসা করতে নয়, শুধুমাত্র নিঃস্বার্থ জনসেবা করতে নেমেছে।

এরকম অবস্থায় এই ধর্মঘটকে সাধারণ মানুষের উপর চাপ সৃষ্টি করে, তাদের অযথা হয়রানির মধ্যে ফেলে ভাড়া বাড়িয়ে নিজেদের লাভ আরও বাড়িয়ে নেওয়ার মালিকী অপকৌশল ছাড়া আর কী-ই বা বলা যেতে পারে! অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যখন অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে হাঁসফাঁস করছে, ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি যখন তাদের কাছে বোঝার উপর আরেকটা শাকের আঁটি, বাস ও ট্যাক্সিমালিকরা তখন ডিজেলের ঐ দাম বাড়াকেই দেখছে এক সুযোগ হিসাবে, যা দেখিয়ে নিজেদের লাভ আরও বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। এ তো জনগণের বিরুদ্ধেই মালিকী ষড়যন্ত্র, যা বিগত সিপিএম সরকারের আমলে রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল, যেখানে যাত্রীসাধারণের মতামতকে কখনও কোনও মূল্যই দেওয়া হয়নি।

নতুন সরকার এখনও পর্যন্ত যে বাস মালিকদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করেনি, এটা আশার কথা। পরিবহন যাত্রী কমিটি একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয় তুলে ধরেছে। ক্রিমিনাল আইনেও আসামীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু পরিবহনের যাত্রীদের কখনই আলোচনায় ডাকা হয় না। ১৯৮৫ সালের ৯ এপ্রিল রাষ্ট্রসংঘে 'কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট' বিষয়ে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত প্রস্তাবে পরিবহনের ভাড়াবৃদ্ধির পূর্বে যাত্রীদের সাথে আলোচনা ও যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। আমরা আশা করব, নতুন সরকার এই দিকটি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবে।

৫ই আগস্ট

সর্বহারার মহান নেতা

কমরেড শিবদাস ঘোষ

স্মরণ দিবসে

সমাবেশ

রানি রাসমণি অ্যাভেনিউ, বিকাল-৪টা

বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

সভাপতি ঃ কমরেড সৌমেন বসু

কমরেড শিবদাস ঘোষের উদ্ধৃতি প্রদর্শনী

৪-৫ আগস্ট, এসপ্ল্যানেড মেট্রো চ্যানেল

উদ্বোধক ঃ কমরেড শঙ্কর সাহা

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ১৩ জুলাই পশ্চিম মেদিনীপুরে (বাঁয়ে) ও ১৫ জুলাই বীরভূমে ডি এম অফিসে বিক্ষোভ।

সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in
মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।